১০ জুলাই ১৯৮৫ □ আনন্দবাজার প্রকাশন □ তিন টাকা

কালামেলা

নতুন

দুধযুক্ত ফ্যারেক্স শক্ত আহারের

দুটি টিনের সঙ্গে!

নতুন ফ্যারেক্স বেশী সুস্বাদু
নতুন ফ্যারেক্স বেশী সম্পূর্ণ

মায়ের মত মমতায় ভরা প্রত্যেকটি চামচ
আপনার বাড়ন্ত শিশুর শরীর বৃদ্ধির জন্যে উপকারী।

নির্বাচিত কয়েকটি শহরে, বিশেষ উপহারের টিনের ওপর
স্টক থাকা পর্য্যন্তই এসুযোগ পাওয়া যাবে।

স্বাস্থ্যের উৎস—গ্ল্যাক্সো

CLARION/B/GX/5/244 BEN

আনন্দমেলা

২৫ আষাঢ় ১৩৯২ ◻ ১০ জুলাই ১৯৮৫ ◻ ১১ বর্ষ ৭ সংখ্যা

গল্প
ভয় কী ? আমি তো আছি । আশাপূর্ণা দেবী ৯
হারুর কলকাতা দর্শন । বিজনকুমার ঘোষ ১৪
ছড়া ও কবিতা
খাদ্যাখাদ্য। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ৮
আলোর চাদর । সুদেব বকসী ১৩
জাপানি ছড়া । শৈলেনকুমার দত্ত ১৩
চট্‌জলদি । মৃণাল বসুচৌধুরী ৩৮
ভৌতিক । প্রমোদ বসু ৩৮
ইচ্ছে । প্রদীপকুমার মিত্র ৩৮
বিদ্যাদেবী । ভগীরথ মিশ্র ৪৭
তুতুলের পুতুল । সৌমিত্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৭
ভুতুড়ে । অমলকান্তি ঘোষ ৫৩
বিশেষ রচনা
গাছের গল্পগাছা । অম্বুজেন্দ্র ঘোষ ৩৬
ধারাবাহিক উপন্যাস
গোলমাল । শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ২৪
শয়তানের চোখ । সমরেশ মজুমদার ২৭
সম্পূর্ণ উপন্যাসের শেষাংশ
জুবিলি সার্কাসের আজব খেলা । অজেয় রায় ৩৯
শার্লক হোমসের গল্প
বুটিদার ফেট্টি । সার আর্থার কোনান ডয়েল ৫১
বিজ্ঞানবিচিত্রা
রক্তের সম্পর্ক । সুভাষ মুখোপাধ্যায় ৭
জেনে নাও । অরূপরতন ভট্টাচার্য ৭
লেখাপড়া
অর্থ জানো (রাজীব .... ইন্দিরা) । দেব-সেনাপতি ৫
সহজে ইংরেজি (সন্ধ্যায় গানের আসর) । প্রসাদ ৫
খেলাধুলো
ডনের সঙ্গে আলাপ । সুজয় সোম ৫৫
ফরাসি টেনিসে অভাবিত ফল । সম্রাট রায় ৫৬
জুলাই একাদশ । অশোক রায় ৫৭
ভিভ্‌ যখন ভয়ানক । রাজা গুপ্ত ৫৮
'চিমা' এখন চোখের মণি । নৃপতি চৌধুরী ৫৯
চিত্রকাহিনী ও কমিকস্‌
টিনটিন ২০, রোভার্সের রয় ২২, টারজান ৩১
সদাশিব ৪৮, গাবলু ৬০
অন্যান্য আকর্ষণ
ধাঁধা ৩২, শব্দসন্ধান ৩২, মজার খেলা ৩৩
হাসিখুশি ৩৩, তোমাদের পাতা ৪৯
প্রচ্ছদ : কৃষ্ণেন্দু চাকী

সম্পাদক : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে বিজিৎকুমার বসু কর্তৃক ৬ ও ৯ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত । দাম তিন টাকা । বিমান মাশুল : ত্রিপুরা ১০ পয়সা ; উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যে ১৫ পয়সা । পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য পত্রিকা

ত্বকের সংক্রমণ যেমনি অস্বস্তিকর ও বিরক্তিকর তেমনি বিচ্ছিরি

প্র্যাগমেটর কাজ করে চারভাবে, তাই সংক্রমণ দূর করে ও চটপট সারিয়ে তোলে।

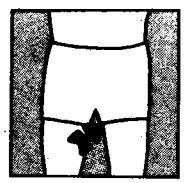

ধোবিজ ইচ্‌—সংক্রামিত কাপড়চোপড় থেকে হয় । 'প্র্যাগমেটর' ব্যবহার করে সারিয়ে তুলুন ।

হাজা—ভেজা পায়ে হতে চায় । দ্রুত আরাম পেতে 'প্র্যাগমেটর' লাগান ।

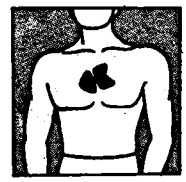

দাদ—শরীরের যে-কোনো জায়গাতেই হতে পারে । অবহেলা করবেন না—উপশমের জন্যে 'প্র্যাগমেটর' ব্যবহার করুন ।

স্বাস্থ্যবিধি না মেনে চললে অথবা সংক্রামিত কাপড়চোপড় থেকে এধরণের ছত্রাকজনিত ত্বকের সংক্রমণ হতে পারে—যে-কোনো সময়েই । প্র্যাগমেটর চারভাবে কাজ করে বলে এসব বালাই দূর হয়ে যায় । ডাক্তাররাও তাই প্র্যাগমেটরই ব্যবহার করতে বলেন।

1 তাড়াতাড়ি ত্বকে ঢোকে
'প্র্যাগমেটর' তাড়াতাড়ি ত্বকে ঢুকে সংক্রামিত জায়গায় ও তার চার পাশে কাজ শুরু করে দেয় ।

2 চটপট চুলকানি বন্ধ করে
'প্র্যাগমেটরে' সংক্রামিত জায়গা আঁচড়ানোর ইচ্ছেকে প্রশমিত করে তাই সংক্রমণও ছড়াতে পারে না ।

3 ছত্রাকজনিক সংক্রামণ রোধে
'প্র্যাগমেটরে' আছে সুপরিচিত ও কার্যকর ছত্রাক-প্রতিরোধী জিনিষ গন্ধক যা গুঁড়ো আকারে থাকায় সংক্রামিত জায়গায় আরো ভালভাবে লাগে ।

4 ভালভাবে সংক্রমণমুক্ত করে
'প্র্যাগমেটর' সংক্রামিত ত্বক সারিয়ে দেয় এবং ভালভাবে সংক্রমণমুক্ত করে দিয়ে ত্বকের স্বাস্থ্য ফেরায় ।

আয়োডেক্স নির্মাতাদের তৈরি

1148 BEN

PRAGMATAR®
Ointment of Cetyl Alcohol,
Cetyl Tar Distillate,
Sulphur and Salicylic Acid 20g.

'প্র্যাগমেটর' মানেই হাতের কাছে দ্রুত আরাম

SKF — AN ESKAYEF PRODUCT
© Eskayef Limited

নতুন ভোর হল নতুন রোদ উঠল

নতুন

সানলাইট

ডিটারজেন্ট পাউডার

আপনার কাপড়ে এনে দেয় রোদের চমক

আপনিও আপনার ঘরে সানলাইটের ঝলমলানি আনুন। নতুন সানলাইট ডিটারজেন্ট পাউডার ওজনে খুব হাল্কা, কিন্তু কাজ দেয় বেশি। দামী পাউডারের মত কাজ দেয়, অথচ দাম কম।

সানলাইটে একটি এমন উপাদান আছে, যা সাধারণ পাউডারে নেই। এটি কাপড়ের প্রতিটি তন্তু থেকে ময়লা বের করে দিয়ে তাতে চমক নিয়ে আসে।

সানলাইটে না হয় হাতের কষ্ট, না হয় কাপড়ের ক্ষতি। আর এর তাজা মনোরম সুগন্ধ আপনার কাপড়ের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়বে।

আপনিও আপনার জীবনে নিয়ে আসুন সানলাইটের চমক। একবার ব্যবহার করে দেখুন—মাত্র ৬ টাকা ৩৫ পয়সায়।

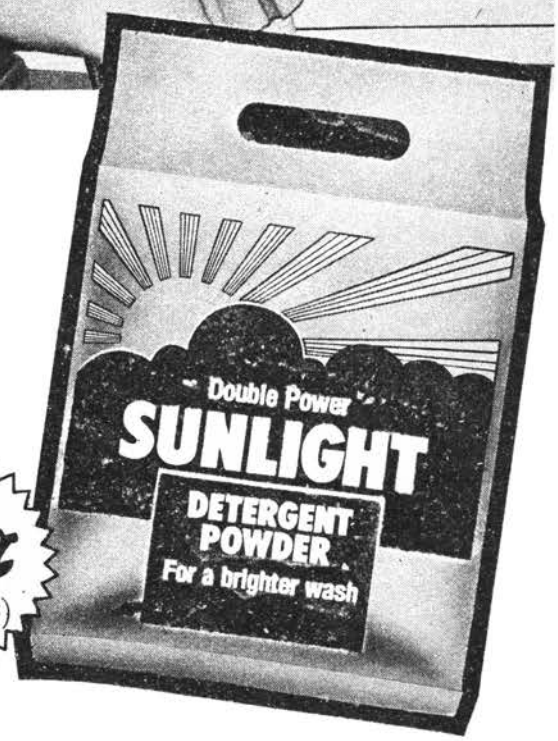

মাত্র
টা. ৬·৩৫
(স্থানীয় কর অতিরিক্ত)

আপনার কাপড়ে এনে দেয় রোদের চমক

হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

OBM/2568 BEN

অর্থ জানো

রাজীব···ইন্দিরা···

একটি ছেলেকে বলা হয়েছিল, রাজীব মানে কী ? সে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল, রাজীব মানে আমাদের প্রধানমন্ত্রী। তাকে আর ভরসা করে ইন্দিরা শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করিনি। নীচের শব্দগুলির গোড়াতেই রাজীব কথাটি দেওয়া হল। প্রতিটি শব্দের পাশে কয়েকটি আনুমানিক অর্থ দেওয়া আছে। যেটি ঠিক মনে হবে, তাতে দাগ দেবে। সবশেষে উত্তরের সঙ্গে মেলাবে। শব্দের অর্থও ঠিক জানতে পারবে।

১। **রাজীব**—(ক) রাজার মতো, (খ) শ্রেষ্ঠ রাজা, (গ) পদ্ম, (ঘ) শালুক।

২। **ইন্দিরা**—(ক) দুর্গা, (খ) দেবরাজ ইন্দ্রের পত্নী, (গ) পদ্ম, (ঘ) লক্ষ্মী।

৩। **বর্তুল**—(ক) লাল, (খ) গোল, (গ) স্থূল, (ঘ) যা ঘুরছে।

৪। **আটপৌরে কাপড়**—(ক) পরনের মোটা কাপড়, (খ) পরনের আঁটসাঁট কাপড়, (গ) অষ্ট প্রহর পরবার কাপড়, (ঘ) পরবার খাটো কাপড়।

৫। **কস্তাপাড়**—(ক) চওড়া কালো পাড়, (খ) চওড়া লাল পাড়, (গ) মোটা পাড়, (ঘ) নকশাকাটা চওড়া পাড়।

উত্তর : ১। **রাজীব**—(গ) পদ্ম। মূলে সংস্কৃত রাজীব শব্দ, যার অর্থ দলরাজীযুক্ত, অর্থাৎ পদ্ম। যেমন, 'চরণরাজীবরাজে' (কবি ভারতচন্দ্র)। 'রাজীবলোচন' কথার অর্থ পদ্মের পাপড়ির মতো চোখ। ২। **ইন্দিরা**—(ঘ) লক্ষ্মী। এটি সংস্কৃত শব্দ। এর অর্থ ইন্দ্ অর্থাৎ ঐশ্বর্য যিনি দান করেন, অর্থাৎ লক্ষ্মী। ৩। **বর্তুল**—(খ) গোল। এটি সংস্কৃত শব্দ। জ্যামিতি পড়ার পর বৃত্ত কী তা তোমরা জানো। সম্ভবত বৃত্ততুল কথাটি থেকে বর্তুল শব্দটি এসেছে। যেমন, 'বৃহৎ সুবর্তুল চক্ষু তাহার মুখের উপর স্থাপন করিয়া বুড়ির উদ্দেশে বলিল, হুঁ-নাতি !' (শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়)। ৪। **আটপৌরে কাপড়**—(গ) অষ্ট প্রহর পরবার কাপড়। যার অর্থ সারাদিন পরবার সাধারণ কাপড়। যেমন—'পরনে আটপৌরে রাঙাপাড় শাড়ি' (শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়)। ৫। **কস্তাপাড়**—(খ) চওড়া লাল পাড়। সম্ভবত মূলে আছে কষায়িত শব্দ, যার অর্থ লাল। যেমন, 'কস্তাপাড় যদি স্কার্টপাড় হইতে পারে, দুর্গাপ্রতিমা বদলাইবে না কেন ?' (বনফুল)।

দেব-সেনাপতি

'অর্থ জানো' বিভাগে (১ মে, ১৯৮৫) 'মঞ্জু' কথাটির অর্থ বোঝাতে একটি উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছিল। তাতে বলা হয়েছিল 'বীণাগুঞ্জিত মঞ্জুভাষিণী'। আসলে হবে 'বীণাগঞ্জিত মঞ্জুভাষিণী'। পার্ক সার্কাস মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা শ্রীমতী ছায়া বাগচী এই ভুলটি ধরিয়ে দিয়েছেন। তাঁকে আমাদের ধন্যবাদ জানাই।

সহজে ইংরেজি

সন্ধ্যায় গানের আসর

চম্বলদের বাড়িতে আজকাল সন্ধ্যাবেলায় মাঝে-মাঝে গানের আসর বসে। তোমাদের মনে আছে কি না জানি না, কিছুদিন আগে একজন বেড়াতে এসেছিলেন। তিনি বিদেশে থাকেন, অনেক দিন ভাল বাংলা গান শোনেননি। মিলি গান শেখে শুনে তিনি খুব খুশি হয়ে বলেছিলেন, "ভালই হল, আজ গান শুনব।" দুঃখের বিষয়, তাঁর সে-আশা পূর্ণ হয়নি, কেননা, মিলির গলা নাকি সে-দিন ভাল ছিল না। তারপর থেকে মা নিয়ম করেছেন, গান শুধু শিখলেই হবে না, তাকে রীতিমতো গান গাইবার অভ্যাস করতে হবে।

Mrs. Roy said that she knew Milly had a good singing voice.
She also said there was no reason why Milly shouldn't be able to sing a song or two if she was requested.

She had been taking regular lessons in Rabindranath's songs.
And when she started taking the lessons Mrs. Roy had already taught her quite a few songs.
"Isn't it strange?" she said. "You used to be more ready to sing before you started going to your music-school."
It was then that Mr. Roy proposed having regular musical evenings at home.

Mrs. Roy couldn't agree more.
"After all," she said, "music is a performing art. You must sing to please others."
Mr. Roy said, "That's what I thought before Milly taught me otherwise."

ফলে, এক-একদিন সন্ধ্যাবেলা দেখা যায়, মিলি গাইছে, শ্রোতা চম্বল আর বাবা-মা, আবার কখনও-কখনও মা গাইছেন, অন্যরা শ্রোতা, এমন কী, চম্বলকেও এক-এক সময় মা আর মিলির সঙ্গে গলা মেলাতে দেখা যায়। বাবা শুধুই শ্রোতা।

Chambal didn't know her mother sang so well. In fact, when Chambal was born she had given up singing seriously for some time.

So, with both Milly and Mother singing, and Chambal joining them from time to time, the musical evenings are getting to be quite delightful.

এবারে দ্যাখো :
অতীতের দুটো ব্যাপারের একটা আগে একটা পরে হলে এইরকম ভাবে বোঝানো হয়—

When she started taking the lessons Mrs. Roy had already taught her a few songs.
When Chambal was born she had given up singing.

প্রসাদ

"দিদা, দিদা, বাবা আজকে এতো দুষ্টুমি করছে কেন?"

"কেন রে ছোটন কি করেছে?"

"দেখ না! লক্ষী ছেলের মত খাচ্ছে না।"

"পেট খারাপ হয়েছে যে। পেট খারাপ হলে হজম হয় না, তাই কিছু খেতে ইচ্ছা করে না।"

"কিন্তু না খেলে যে গায়ে জোর পাবে না—আর কালকে বেরোবে কি করে?"

"তুমি কিছু ভেবো না। আমি এমন জিনিস্ দেবো যা চট করে হজম হয়ে যাবে। জান সেটা কি? ওই যে তুমি রোজ যেটা খাও!"

"জানি! রবিনসন্স্ বার্লি।"

"ঠিক বলেছ। এই বার্লি খুব হাল্কা খাবার বলে চট করে হজম হয়। তাছাড়া খাঁটি বার্লির সব গুণই রবিনসন্স্ বার্লিতে আছে। তাই পেট খারাপ হলে ডাক্তারবাবুরাও রবিনসন্স্ বার্লি খেতে বলেন।"

"আচ্ছা দিদা..."

"আর কথা নয়। নাও এই এক গেলাস বার্লি বাবাকে দিয়ে এস দেখি?"

"বাবা, বাবা, এই নাও তোমার রবিনসন্স্ বার্লি।"

রবিনসন্স্ বার্লি

হালকা আহার আর সহজ হজমের পথ্য

LINTAS(C)/ROB/4/2416 BG

রক্তের সম্পর্ক

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

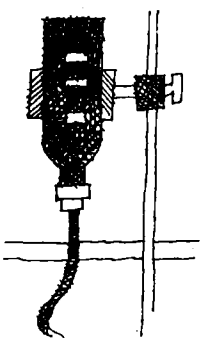

হাড়ের গড়নে, ভ্রূণের বেড়ে ওঠায় একের সঙ্গে অন্যের যে মিল, তা হয় খালি চোখে নয় অণুবীক্ষণেই ধরা পড়ে। বংশলতায় যে প্রাণীরা যত কাছাকাছি, তাদের মধ্যে থাকে আরও অনেক অদৃশ্য মিল। প্রত্যেক প্রাণীর রক্তে আর পেশিতন্তুতে আছে কিছু বিশেষ বিশেষ রাসায়নিক উপাদান। দুটি প্রাণীর রাসায়নিকের মধ্যে কতটা সাদৃশ্য আছে তা জানবার নির্ভুল উপায় বার করেছেন সেইসব বৈজ্ঞানিক, যাঁরা রক্ত নিয়ে গবেষণা করেন। তাঁরা দেখিয়েছেন, কিছু বিশেষ শ্রেণীর প্রাণীতে প্রাণীতে—যেমন, মানুষে আর পুচ্ছহীন বানরে কিংবা কচ্ছপে আর কুমিরে—আছে রক্তের সম্পর্ক।

অনেক রোগের জীবাণু কেবল সেই সব প্রাণীর মধ্যেই পাওয়া যায়, যাদের রক্তে আর জীবাণুকোষে মিল আছে। এই সব জীবাণুর বেঁচে থাকার জন্যে এদের শরীরের বিশেষ রাসায়নিকের দরকার পড়ে। সেই জন্যে শুধু মানুষ আর বন-মানুষেরই হাম হয়। এরাই উকুনের পাল্লায় পড়ে।

সব বড়-বড় শহরেই এখন ব্লাড ব্যাঙ্কের চলন হয়েছে। তোমার দাদা-দিদিরাও নিশ্চয় মাঝে-মধ্যে স্বেচ্ছায় রক্ত দেন। তাঁদের মুখে ব্লাড গ্রুপের কথাও হয়তো শুনে থাকবে। যার রক্তে যেমন রাসায়নিক উপাদান, সেই মতো সব মানুষকেই মোটমাট চার শ্রেণীতে বা গ্রুপে ভাগ করা যায়। এই গ্রুপগুলো হল 'এ', 'বি', 'এ-বি' আর 'ও'।

যেসব রাসায়নিক উপাদানের তফাতে মানুষে মানুষে রক্তের তফাত হয়, সেই সব উপাদান বানরের রক্তেও একইভাবে পাওয়া যায়।

তাহলে ?

এ-কথা জোর দিয়েই বলা যায় : এইসব প্রাণীর মধ্যে রয়েছে আত্মীয়তার সম্পর্ক।

তা হলে এদের পূর্বপুরুষও নিশ্চয় এক। (ক্রমশ)

জেনে নাও

কচি পাতা ধূসর কেন

আমগাছে যখন নতুন পাতা ধরে তখন সে পাতা প্রথমে ধূসর রঙের, তারপরে তা হালকা সবুজ, সবশেষে সে সবুজ গাঢ় হয়ে ওঠে। এ-শুধু আমগাছে নয়, অনেক গাছের পাতার বেলাতেই এটা সত্যি।

কেন, গাছের পাতা প্রথমেই সবুজ না হয়ে ধূসর থাকে ?

পাতায় অনেক রঙিন পদার্থ থাকে। এই সব পদার্থের প্রতিটিরই এক-একটা নির্দিষ্ট রঙ আছে। ক্লোরোফিল নামটা অনেকেরই জানা, তার রঙ সবুজ। সেরকম আর একটা পদার্থ কেরোটিন। তার রঙ হলদে। যখন পাতায় অনেকগুলো রঙের পদার্থ থাকে, তখন সেইসব পদার্থের মেশানো রঙটাই পাতায় ধরা পড়ে। অনেক গাছের পাতায় ক্লোরোফিল আর কেরোটিন থাকে বলে সেই সব গাছের পাতা সবুজ আর হলুদ-মেশানো সবুজ রঙই হয়।

কিন্তু কচি পাতায় এক রঙ আর পাতা পুরনো হলে আর এক রঙ কেন ?

অনেক গাছের কচি পাতায় একটা লাল পদার্থ থাকে। তার নাম অ্যানথোসায়ানাইন। কচি পাতায় এর পরিমাণটা বেশি বলে পাতার রঙটা দেখায় কিছুটা গোলাপি বা লালচে। তারপরে পাতায় তৈরি হয় ক্লোরোফিল আর কেরোটিন। তখন পাতার রঙ আস্তে আস্তে হয়ে পড়ে সবুজ।

তাই কচি পাতা ধূসর হলেও পুরনো পাতা সে-রকম নয়।

নাক ডাকে কেন

ঘুমের মধ্যে কারও-কারও নাক ডাকতে শোনা যায়। যাদের নাক ডাকে ঘুমোলেই তাদের নাক থেকে গর্‌র্ গর্‌র্ করে শব্দ বেরোয়, জেগে থাকলে নয়—এটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার নয় কি ?

নাক ডাকে কেন ?

সাধারণভাবে আমরা সবাই নাক দিয়ে নিশ্বাস নিই। কিন্তু কিছু-কিছু মানুষ আছেন, ঘুমোলে নানা কারণেই যাঁদের নিশ্বাস নেওয়ার কাজ চলে মুখ দিয়ে। এমন হতে পারে সর্দিতে নাক তখন বোজানো বা মুখ রয়েছে হাঁ হয়ে।

যখন আমরা জেগে থাকি, তখন আমাদের মুখের ভেতরে তালুটা থাকে টান-টান অবস্থায়। ঘুমের সময়ে সেই টান-টান ভাবটা একটু কমে। ফলে মুখের ভেতর দিয়ে নিশ্বাস-প্রশ্বাসে বাতাস যাতায়াতের সময়ে তালুর ঢিলে চামড়াটা কাঁপতে থাকে। আর এইজন্যই নাক ডাকে।

অরূপরতন ভট্টাচার্য

খাদ্যাখাদ্য

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

তোমার আমার খিদে পেলে
খাই পেয়ারা কলা,
ওস্তাদজি সেই সময়ে
সাধতে বসেন গলা !
শান্তিপুরের জামাইবাবু
মানুষ অতি শান্ত,
খাবার দেখলেই বলেন, ওরে,
আয়নাখানা আন তো !

আছেন মস্ত সওদাগর
হিম্মতসিং খান্না,
হিরে-মুক্তো গুঁড়ো ছাড়া
আর কিচ্ছুই খান না !
পাশের ফ্ল্যাটের ছোট্ট মেয়ে
বায়নার নেই অন্ত,
টুথপেস্ট সে খাবেই খাবে,
পায়েসে মাজে দন্ত !

মিষ্টি কথায় চিঁড়ে ভেজান
রামমনোহর পাত্র
চায়ের মধ্যে চিনি দিলেই
জ্বলে তাঁহার গাত্র !
গজেনবাবু ম্যাজিক দেখান
জ্যান্ত আগুন খাওয়া,
পদ্য যাঁরা লেখেন, তাঁদের
খাদ্য দখিন হাওয়া !

এর চেয়ে ভাই তুমি আমি
আছি দেদার মজায়,
মনের সুখে খিদে মেটাই
মণ্ডা-মিঠাই-গজায় !

ছবি : অনুপ রায়

'অনেক হাজার টাকা দিন, তবে ছেলে ছাড়ব !'

ভয় কী ? আমি তো আছি !

আশাপূর্ণা দেবী

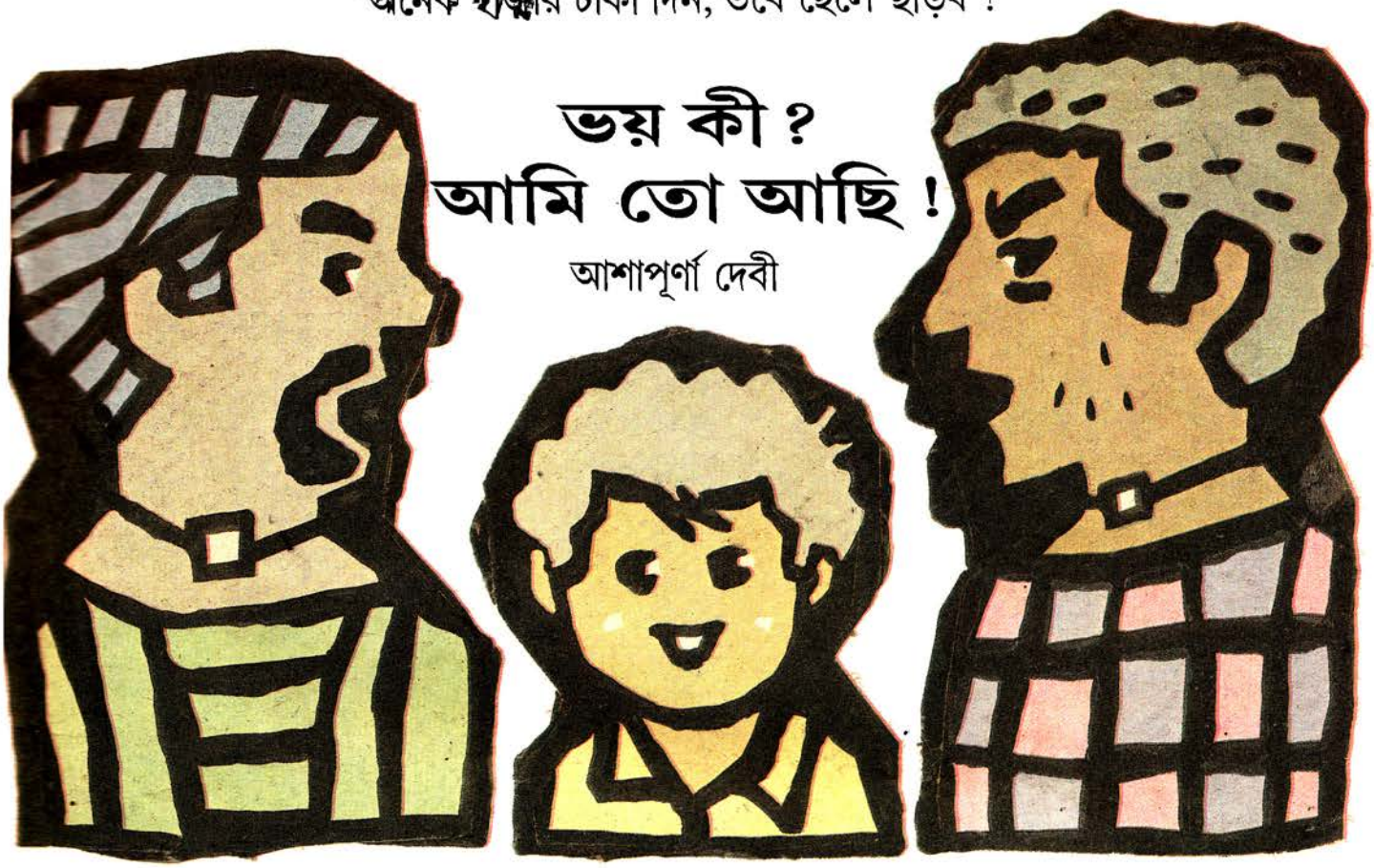

রাগ ক্রমশই চড়ে যাচ্ছিল জেব্রার। মা আর দিদি ভেবেছেটা কী ? তিন ঘণ্টা ধরে শুধু নিজেদের শাড়ি জামা ফ্রক আর হ্যানো-ত্যানো বাছাই হচ্ছে, জেব্রার জিনিসটার কথা কানেই নিচ্ছে না ! জেব্রা যেই বলছে, "আর কতক্ষণ এইসব পচা-পচা জিনিস দেখে সময় খরচ করবে ? আমার জিনিসটা কিনবে চলো," ব্যস্, সেই মা দিদি দু'জনেই চড়া গলায় বলে উঠেছে, "হচ্ছে, হচ্ছে ! আগে আসল জিনিসগুলো করে নিতে দে ! জ্বালাসনে।"

যেন এই বাজে জিনিসগুলোই আসল, জেব্রারটা কিছু নয়।

জিনিসটা তো মার্কেটে ঢোকার মুখেই দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। ঠিক বাবুইয়ের মতন মেশিনগান। একটা দোকানে ঝুলছিল সারি সারি। বাবুই তো বলেছিল, ওরটা নিউ মার্কেট থেকে কেনা। সেই জন্যেই না কী-সব কিনতে-টিনতে নিউ মার্কেটে আসা হবে শুনে আহ্লাদ হয়েছিল জেব্রার। আবার মার্কেটে ঢোকার মুখে সেটা দেখতে পেয়ে আরও আহ্লাদ হয়েছিল। বলে উঠেছিল, "মা, মা, এই যে এখানে রয়েছে। এইবেলা কিনে নাও, পরে ফুরিয়ে যাবে।"

তা মা তখন বলে দিলেন কিনা, "আহা, মেশিনগানের বড্ড অভাব তোমার ! বাড়ি ঠ্যাঙালে হয়তো গোটা আষ্টেক বেরোবে। আসল জিনিসগুলো কেনা হোক আগে।"

আসল ! আসল। নিজেদের যা কিছু সব আসল ! আর জেব্রার ?

তখন বাবা বলেছিলেন, "হবে, হবে ! দেখছিস তো তোর মায়ের শাড়ি বাছা আর শেষ হচ্ছে না !"

সেই বাবা কিনা তখন এত লোকের মাঝখানে কান মলে দিলেন জেব্রার। উঃ ! এত অপমান ! কেন, কী করেছিল জেব্রা, শুধু তো একবার মা'কে ঠেলছিল আর একটু-একটু চিমটি কাটছিল চলো না চলো না··· বলে।

তা গিয়েছিল মা ? কেবলই তো বলছিল, "আচ্ছা এক বেয়াড়া ছেলে হয়েছে বাবা ! চলো না বাড়ি, হচ্ছে তোমার ! মাথা খারাপ করে দিল !" তাহলে ? জেব্রার মাথাটাই বা খারাপ হবে না কেন ? বলবে না "ইঃ, নিজের বেলায় আঁটিসুটি পরের বেলায় দাঁতকপাটি ! আমার মাত্র তিন চারটে মেশিনগান আছে বলে বলা হচ্ছে, আর নিজের কী ? চারশো-পাঁচশোটা শাড়ি নেই ?" অমনি কিনা বাবা কান ধরে টেনে বলে উঠলেন, "ভারী পাকা হয়েছ দেখছি। কেনা হবে না তোমার জিনিস, বাস্। বাড়ি চলো, দেখাচ্ছি মজা !"

আচ্ছা ! জেব্রাও এ অপমানের শোধ নেবে ! তোমাদেরও মজা দেখাবে ! তখন যত পারো, মজা দেখো। কেঁদে-কেঁদে গড়াগড়ি দিও। কলা, কলা !

আস্তে-আস্তে সরতে লাগল জেব্রা। দিদির কাছ থেকে, মা-বাবার কাছ থেকে।

নিউ মার্কেটের মতো জায়গা থেকে একটা ছোট ছেলের হারিয়ে যাওয়া কোনও ব্যাপারই নয়। আর সেই হারিয়ে যাওয়াটা যদি ইচ্ছে করে হয় ! কত ঘোরপ্যাঁচ রাস্তা, মোড়, কত গলিঘুঁজি, কত গেট ! একবার চোখছাড়া হতে পারলেই তো হয়ে গেল !

জেব্রা আরও সরতে লাগল।

যেখানটায় গিয়ে পড়ল জেব্রা, সেদিকটা হচ্ছে মার্কেটের একটা ওঁচা দিক। যত রাজ্যের ভাঙাচোরা বেতের চেয়ার, টেবিল, ঝুড়িঝোড়া! গোছা-গোছা বেত ছড়িয়ে কাজ করছে কিছু-কিছু লোক! এ-সবের মধ্যে থেকে কী করে বেরিয়ে পড়ে রাস্তায় যাবে তাই ভাবছিল জেব্রা মুখের মধ্যে একটা আঙুল পুরে। হঠাৎ দুটো লোক এগিয়ে এসে বলে উঠল, "এই তুই এইটুকু ছেলে, এখানে একা-একা ঘুরছিস যে?"

জেব্রা চট করে বুঝে নিল, নিশ্চয় ছেলেধরা! ছেলেধরা ছাড়া আর কিছু নয়! না হলে লুঙ্গি আর গেঞ্জির সঙ্গে গলায় রুপোর ওই চৌকো-মতন কী একটা পরে কেউ?

জেব্রা চড়া গলায় বলে উঠল, "'তুই' বলছ যে? আমাকে রাস্তার ছেলে পেয়েছ?"

রসিদ আর বংশী হেসে উঠল খ্যাকখ্যাক করে, তারপর বলল, "আচ্ছা নাহয় আপনি রাজবাড়িরই ছেলে! এখন বলুন তো প্রভু, একা ঘুরছেন কেন এই সন্ধে-সন্ধে কালে?"

জেব্রা বলল, "ঠাট্টা করবে না বলে দিচ্ছি।"

"ওরে বাবা! এ সত্যিই রাজা-বাদশার ছানা রে বংশী! তা বলেই ফেলো না মানিক এমন একখানি চাঁদের মতো ছেলে তুমি, রাস্তায় একা কেন?"

জেব্রা ক্রুদ্ধ। "তাতে তোমাদের কী? এখানটা তোমাদের কেনা?"

"আরেব্বাস্! বংশী রে। এ কী ছেলে রে। হারিয়ে গিয়ে কান্নার ধার ধারছে না।"

জেব্রা বলল, "কে বলেছে তোমাদের, আমি হারিয়ে গেছি?"

"গেছ না তো সঙ্গে মা-বাপ, দাদা-কাকা কেউ কোথাও নেই কেন মহারাজ?"

"আমার ইচ্ছে। ইচ্ছে করে চলে এসেছি আমি!"

রসিদ আর বংশী দুজনেই বলে ওঠে, "যা ভেবেছি তাই। বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছে।"

জেব্রা জোরগলায় বলল, "বোকার মতো কথা বলছ কেন? বাড়ি থেকে নিউ মার্কেটে একা আসতে পারি আমি?"

রসিদ বলে উঠল, "সেই কথাই তো বলছি।"

বংশী আর রসিদ দুজনেই সবেমাত্র জেল থেকে খালাস পেয়ে রুজি-রোজগারের ধান্ধায় এদিক-ওদিক ঘুরছিল, একটা পাকা আপেলের মতো ছেলেকে একা ঘুরতে দেখেই আহ্লাদে চোখ জ্বলে উঠেছে তাদের। এই তো একটা তালুক হাতে এসে গেছে!

মনের আহ্লাদ চেপে বলে উঠল রসিদ, "তা বাড়িটা কোথায় চাঁদু? বলে দাও না, পৌঁছে দিইগে!"

"তা আর নয়? বুঝেছি অভিসন্ধি···"

জেব্রার নীলচে-আভা মার্বেলগুলির মতো ঝকঝকে চোখ দুটোয় ব্যঙ্গের ঝিলিক খেলে যায়। মুখে এক টুকরো বিচ্ছু হাসি।

"ওই বলে কিড্‌ন্যাপ করে নিয়ে যাবে আমাকে, আর আমার বাবার কাছ থেকে এত-এত টাকা চাইবে, এই তো? না-দিলে ছেলেকে মেরে ফেলবার ভয় দেখাবে। জানি না যেন।"

রসিদ বলে ওঠে, "বংশী!"

বংশী বলে ওঠে, "রসিদ।" আর···

দু'জনে বলে ওঠে, "এ কী ছেলে রে। এ যে নদীর এপারে পুঁতলে ওপারে গাছ গজায়।"

জেব্রা সন্দেহের গলায় বলল, "চুপিচুপি পোঁতার কথা কী হচ্ছে? আমায় মেরে ফেলে নদীর পারে পুঁতে ফেলবে?"

বংশী কপালে হাত দিয়ে বলে ওঠে, "ওরে সর্বনেশে ছেলে, তুই ভগবান না শয়তান রে? এইটুকু ছেলে, এসব কী বলছিস, অ্যাঁ? শিখলি কোথায় এসব?"

জেব্রা বলল, "কোথা থেকে আবার? এমনি এমনিই শিখেছি। তো মেরে ফেললেও ভাল। মা-বাবা আরও জব্দ হবে! বেশ হবে!"

"হুঁ! একখানা ছেলে বটে! নাম কী রে তোর?"

"ফের? ফের 'তুই' বলা হচ্ছে?"

"আচ্ছা বাবা, আচ্ছা, ঘাট মানছি। নাম কী জাদু?"

"কেন? নাম বলতে যাব কেন? আমার নামে তোমাদের কী দরকার?"

"আরে বাবা! বলছি তো বাড়ি পৌঁছে দেব!"

"দায় পড়েছে আমার বাড়ি যেতে। এমন হারিয়ে যাব না, মা-বাবা তখন দেখবে মজা!"

"হুঁ! তাই বলো! মা-বাপকে জব্দ করতে পালিয়ে আসা হয়েছে। কত বয়েস রে?"

জেব্রা এখন একটু অহঙ্কারের গলায় বলল, "ছ' বছর তিন মাস! একটা খোকা ভেবো না আমায়!"

"ওরে বাবা! তাই ভাবতে পারি? কিন্তু একটু 'তুই' 'তুই' করতে দে না মানিক! এমন একখানা মারকাটারি ছেলে তুই, 'আপনি' 'আজ্ঞে' করে কথা বলে সুখ হচ্ছে না!"

জেব্রা হঠাৎ মুক্তোপাটি দাঁতে মুক্তো-ঝরানো হাসি হেসে বলে, "কে তোমাদের সাধছে আমার সঙ্গে কথা বলতে?"

রসিদ বলল, "তোকে দেখে বড় ভাল লেগে গেছে রে! তাই ভাবছি ডেরায় নিয়ে গিয়ে পুষি তোকে।"

"পুষি মানে?" জেব্রার চোখে আগুনের ঝিলিক, "আমি পাখি, না বেড়াল-কুকুর যে পুষবে?"

বংশী বলে উঠল, "ষাট ষাট! বেড়াল-কুকুর হতে যাবি কেন বাপ? সোনার চাঁদ একখানা তুই। বাপ-মার কাছে যখন যেতেই মন নেই, আমাদের কাছেই থাকবি, তাই বলছি।"

আবার হি-হি করে হেসে ওঠে জেব্রা। বলে, "ঘুরেফিরে সেই এক কথা! আমায় ভারী বোকা পেয়েছ? তবে যেতে পারি তোমাদের সঙ্গে। যদি আমায় জ্বালাতন না করো! কী খাও তোমরা?"

বংশী মলিন হেসে বলে, "গরিব মানুষ, কী আর খাব রাজপুত্তুর। ডালভাত চচ্চড়ি।"

জেব্রার ভুরুটা কুঁচকে গেল। বলল, "তোমরা গরিব মানুষ?"

হ্যাহ্যা করে হেসে উঠল রসিদ। বলল, "আমাদের দেখে কি বড়মানুষ মনে হয়েছিল তোর?"

জেব্রা অনায়াসে বলে উঠল, "নাঃ! আমি ভেবেছিলুম চোর।"

"অ্যাঁ। কী বললি? আমাদের দেখে তোর 'চোর' মনে হয়েছিল?"

"হয়েছিল তো। একদম চোরের মতন দেখতে তো

তোমরা !"

রসিদ প্রায় ককিয়ে উঠল, "ও বংশী ! এ ছেলে সত্যি মানুষের ঘরের ছেলে তো ? না কি আর কিছু ?"

"বুঝতে পারছি না গুরু !"

জেব্রা বলে ওঠে, "আবার চুপিচুপি কথা হচ্ছে ? সোজা করে জোরে-জোরে কথা বলতে পারো না ? আগে মনে হয়েছিল চোর, এখন মনে হচ্ছে না। গরিব হয়ে ভালই হয়েছে। এখন চলো শিগগির তোমাদের বাড়ি। মা-বাবা যদি খুঁজতে-খুঁজতে এদিকে চলে আসে ! শিগ-গি-র চলো ! তোমাদের বাড়িটা বড় রাস্তার ওপর ?"

ওরা একটু হাসে। "আমাদের বাড়িটি এমন জায়গায় তোর মা-বাপ তো দূরের কথা, পুলিশের বাপ-ঠাকুর্দারও সাধ্যি নেই খুঁজে বার করে। তবে তোকে বাবু এই রাজপুত্তুরের মতন জামাটি ছেড়ে যেতে হবে ! শুধু গেঞ্জি পরে চল।"

জেব্রা আবার মুক্তো ছড়িয়ে হেসে ওঠে, "বুঝেছি। বুঝেছি। ছদ্মবেশ করতে হবে। কী মজা ! কী মজা ! গেঞ্জিতে খুব করে ধুলো মাখিয়ে নেব ?"

বলেই জামাটা খুলে ফেলে রসিদের হাতে দিয়ে, দু'হাতের দশটা আঙুলের চালনায়, পরিপাটি-আঁচড়ানো মাথার চুলগুলো কাকের বাসা করে ফেলে হাসে হি হি করে।

রসিদ আর বংশী দু'জনে চোখোচোখি করে। যার ভাষা হচ্ছে : এ কোন্ স্বর্গ থেকে খসে পড়া ছেলে রে বাবা !

রসিদের কথা মিথ্যে নয়। এমন একটা হতবিচ্ছিরি জটিল পথ দিয়ে নিয়ে এল ওরা, মনে হচ্ছে না কলকাতা শহরের কোনওখানে। বাড়ি তো ভারী ! টিনের চাল, এবড়ো-খেবড়ো ইঁটের দেওয়াল। একটা দড়ির খাটিয়ায় বসতে দিল ওরা জেব্রাকে। আর একটা কলাই-করা থালায় দু'পিস পাউরুটি আর একটা রসগোল্লা ধরে দিয়ে রসিদ বলল, "দেখছিস তো আমাদের অবস্থা। তোর কত কষ্ট হবে ! কত ভাল-ভাল খাওয়া অব্যেস তোর !"

জেব্রা করুণার গলায় বলে, "তা আর তো গরিব থাকবে না তোমরা।"

"থাকব না ? কী করে ?"

"বাঃ। আমার মা-বাবার টাকাগুলো তো সব তোমাদের কাছেই চলে আসবে ! ঠিক হবে ! বেশ হবে। আচ্ছা হবে ! তিন ঘণ্টা ধরে গোছা-গোছা শাড়ি কেনা লবডঙ্কা হয়ে যাবে !"

"কিন্তু তোর মা-বাপের টাকা আমাদের কাছে চলে আসবে কী করে ?"

"কী করে আবার। এত বোকা কেন তোমরা ! যখন টিভিতে নিরুদ্দেশ ঘোষণা হবে : 'জেব্রা নামের এই ছেলেটি সোমবার হইতে নিখোঁজ—' তখন 'সন্ধান জানাইবার ঠিকানায়' তো দেখা যাবে একশো একুশ নম্বর গুরুসদয় দত্ত রোড, কলিকাতা। তখন তোমরা আমায় সেখানে নিয়ে গিয়ে সন্ধান জানাইবে। আর বলবে, আগে অনেক হাজার হাজার টাকা দিন, তবে ছেলে ছাড়ব। তখন, হি হি, সব টাকা দিয়ে দেবে।"

বংশী উদাস গলায় বলে, "আর তোর বাবা যদি আমাদের ধরে ফেলে পুলিশে দিয়ে দেয় ?"

জেব্রা জোর গলায় বলে, "ইস্ ! দেবে বই কী ! তোমরা তো আমার বন্ধু হবে। বাবা যদি তোমাদের মনে কষ্ট দেয়, টাকা না দেয়, তো যাবই না ওদের কাছে। আমার সঙ্গে চালাকি চালাবে ? মেশিনগান কিনে দেওয়া হল না, কান মলে দেওয়া হল, আবার টাকা দেবে না ? ভারী শস্তা !"

রাত্রে শোবার সময় জেব্রা কিছুক্ষণ জেগে থাকে, আস্তে বলে, "গরিবদের বিছানায় কীরকম কীরকম একটা গন্ধ হয়, তাই না ? আর ফ্যানও থাকে না, কী বলো ?"

তারপর একসময় ঘুমিয়ে পড়ে।

বংশী আস্তে বলে, "কী ঠিক করলি গুরু ?"

রসিদ নিশ্বাস ফেলে বলে, "ভাবছি যা থাকে কপালে, কাল দিয়েই আসব।"

"কপালে হয়তো আবার শ্রীঘর।"

"সে তো আমাদের ভাতজল।"

বংশী বলে, "ছেলেটা কিন্তু একটা জুয়েল। দলে রাখতে পারলে ভবিষ্যতে হয়তো কপাল ফিরে যেত গুরু।"

রসিদ একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "নাঃ, এ ছেলে নয়, ভগবান। একদিন তো কোথাও না কোথাও জবাব দিতে হবে।"

সকালে উঠে জেব্রা একটু মলিন মুখে বলে, "একটা বড় ভুল হয়ে গেছে বংশীদা। টুথব্রাশ টুথপেস্টটা আনা হয়নি। আর একটা শার্ট-প্যান্ট !"

রসিদ মনে মনে হেসে বলে, "সত্যি এটা তো খুব মুশকিলের কথা ! তবে চলো একবার তোমায় নিয়ে গিয়ে ঝাঁ করে নিয়ে আসি জিনিসগুলো।"

জেব্রার মুখে হাজার বাতির আলো ফুটে ওঠে। "তাই চলো, অ্যাঁ ! নিয়েই চলে আসব। কেমন ? দু'তিনটে জামাও নিতে পারি।"

বাড়ির কাছাকাছি এসে রসিদ আর বংশী বলে, "এটুকু তুমি একাই চলে যেতে পারবে, কী বলো ?"

জেব্রা তার পেটেন্ট হিহি হাসিটি হেসে বলে, "কেন ? ভয় করছে বুঝি, বাবা তোমাদের পুলিশে দিয়ে দেবে ? ভয় কী ? আমি তো আছি !"

দু'হাতে দু'জনের হাত ধরে গটগট করে নিজেদের মস্ত বাড়ির মস্ত গেটটা ঠেলে ঢুকে যায় জেব্রা।

ছবি : দেবাশিস দেব

গ্যেটে তাঁর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্ম 'ফাউস্ট' লিখেছিলেন প্রায় সারাজীবন ধরে। এর প্রথম খণ্ড লিখতে সময় লেগেছিল ত্রিশ বছর আর দ্বিতীয় খণ্ড লিখতে পঁচিশ বছর।

জেতো!

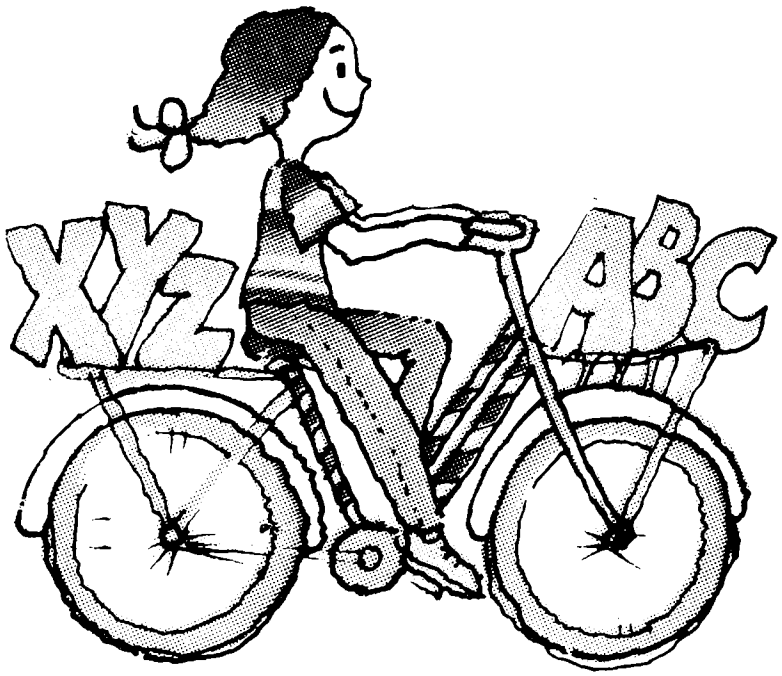

প্রথম পুরস্কারঃ আমেরিকা ও জাপানের ডিজনীল্যান্ডে উড়ে যাতায়াতের সুযোগ!

দ্বিতীয় পুরস্কারঃ দারুণ সব স্পোর্টস বাইক!

প্রথম মেলা প্রবেশপত্রের পুরস্কার—প্রতি হপ্তাতেইঃ চমৎকার ডিজিটাল ওয়াচ

শিগ্‌গির! প্রতিযোগিতা বন্ধের তারিখ ১৪-ই সেপ্টেম্বর ১৯৮৫

যোগ দাও

পপিন্স 'স্পেল-এ-প্রাইজ' কনটেস্টে

প্রবেশপত্রের ফর্ম মিলবে তোমার প্রিয় দোকানেই!

everest/85/PP/126-bn

আলোর চাদর

সুদেব বক্সী

আলোর চাদর হয়নি তখনও কাচা
চাদরের রঙ নিখুঁত হলুদকাঁচা !
হঠাৎ আকাশে মেঘের দানব খাড়া
গর্দান নেবে—হাতে সে নিয়েছে খাঁড়া ।
হেঁকে বলে, "থাম্, কোথাও গেলেই বাধা,
আকাশের নীচে হয়ে থাক্, গোরুবাঁধা ।"
নাড়েনি পশুরা লেজ-কান-শিং-দাড়ি
সবাই দিয়েছে যে যার চলায় দাঁড়ি ।
ওড়েনি ধুলোরা জমে আছে পথে গাদা,
হাসেনি ফুলেরা কাশ-জুঁই-বেল-গাঁদা ।
থম্‌কে থাকল গাছে-গাছে কুঁড়ি-ফোটা
কেবল নেড়েছে মেঘেরা ; বৃষ্টি-ফোঁটা
নিজেকে ঝরিয়ে পথকে করেছে কাদা,
চাদরের নীচে মেঘেরা সেরেছে কাঁদা !
আলোর চাদর শুকিয়ে নিজের ছাদে,
আকাশ সেজেছে অপরূপ ছিরি-ছাঁদে !
আবার সূর্য আলোর চাদর কাচে,
রঙ কি উঠেছে ? দেখছি চোখের কাঁচে !

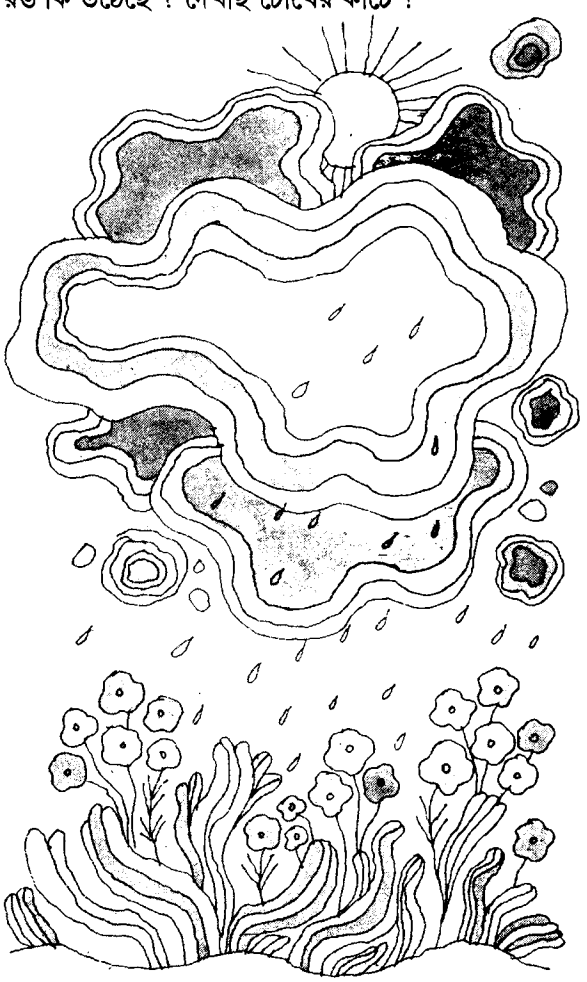

জাপানি ছড়া

শৈলেনকুমার দত্ত

ইয়াসুমো ইয়াশিরো কাছাকাছি থাকে,
টোকিওর কাটাকুরা তেল দেয় নাকে ।
মোচিজুকি টুকিটাকি যা যা কিনে আনে
নাকামুরা ইয়োশিমি কী করে তা জানে !
হায়াশিদা এল বুঝি মারুকামা থেকে,
লাগাটোমা সব টাকা পাঠিয়েছে চেকে ।
ফুজিয়ামা দেখে দেখে সুগিরামা বলে,
হিরোশিমা নাগাসাকি আজও টলমলে ।
ফুজিয়ারা গান গায় ইচিগায়া শোনে,
আরিকুয়ো আকাশের সব তারা গোনে ।
ইয়ামাহা গাড়ি দেখে কাকিসুবো ভাবে,
কিনবে যে অত টাকা কোথা থেকে পাবে !
তুলি হাতে ওকাকুরা জোড়াসাঁকো এসে,
এ দেশের ভালবাসা নিয়ে গেছে দেশে ।
রিকুটারো ফুকুদা'র কবিতার খাতা,
ছড়া নাকি ছিল তাতে পুরো একপাতা !

ছবি : দেবাশিস দেব

হারুর কামড় খেয়ে পুলিশ যখন ছটফট করছে…

হারুর কলকাতা দর্শন

বিজনকুমার ঘোষ

দিন যায়। খুকু সেদিন খুব ধমক খেল দাদার কাছে। ওর অপরাধ, হারু বলে ডেকেছিল।

কান্ত বলে, "কেন, দাদা বলতে লজ্জা করে ? তোর চাইতে দেখতে অনেক বড়। এবার থেকে হারুদা বলবি।"

শান্ত বলে, "আর ওর যা বুদ্ধি, ইস্কুলে পড়লে তোর চেয়ে বেশি নম্বর পেত !"

বলতে কি, মুচকুন্দপুরের নিঃসঙ্গ জীবনে একা হারুই তো মাতিয়ে রেখেছে। আগে দু' একটি ছেলে যদি বা খেলতে আসত, এখন তাও আসে না। গরমের সময় রাতে বিকাশবাবু দরজা হাট করে খুলে ঘুমোন। বাতাস আসে, কিন্তু চোর আসে না। ওরা জানে, হারুর চোখে ঘুম নেই। বারান্দায় পাহারা দিচ্ছে। লেজের একটা ঝাপটা খেলে জন্মের মতো চুরি করা ঘুচে যাবে !

ছুটির দিনে পড়াশুনোর পর তিন ভাই-বোন বারান্দায় বসে রেকর্ড-প্লেয়ারে গান শোনে। হারু গান বলতে অজ্ঞান। রেলের পুকুর থেকে ওকে তখন ডেকে নিয়ে আসে কান্ত। বিশেষ করে সেই গানটা, নদী আপন বেগে আপনি হারা, শোনা মাত্র হারুর লেজের ডগাটা তিরতির করে কাঁপতে শুরু করে। শান্ত, কান্ত আর খুকু এসব জিনিস স্পষ্ট লক্ষ করেছে।

খুকু জিজ্ঞেস করে, "দাদা, হারুদার হৃদয় কি লেজের ডগায় থাকে ?"

"তা কেন ?" শান্তর জবাব, "আনন্দের প্রকাশ এক-এক জীবের এক-এক রকম। কেউ খুশি হয়ে তুড়ি দেয়, কেউ লাফাতে থাকে, কেউ বা দোকানে ঢুকে দশ টাকার রসগোল্লা খেয়ে ফেলে, এই রকম আর কি !

কান্ত লাফিয়ে ওঠে, "নদীর নামটা সবচেয়ে বেশি পছন্দ কেন বলো তো দাদা ?"

"নদীতেই যে জন্ম। একটা টান তো থাকবেই।" ছোট ভাইয়ের ছেলেমানুষি প্রশ্নে একটু হেসে উঠল শান্ত।

সেদিন বিকাশবাবু আচমকা বিপদে পড়ে গেলেন। ট্রেন চলাচলে দারুণ গোলযোগ। কখনও ওভারহেড তার ছিঁড়ে যায় ঝড়ে, কখনও বা দরকারি যন্ত্রপাতি চুরি হয়। ফলে ট্রেনও অনিয়মিত। আগেও মুচকুন্দপুর স্টেশনে এসব ঝামেলা যে হয়নি তা নয়। তখন লোকরা টিকিট কাটত না বলে এসব নিয়ে মাথাও ঘামাত না। ভাবত, বিনা পয়সার ট্রেন একটু লেট করেই থাকে। কিন্তু এখন নিয়মিত টিকিট কাটে, তাই অনিয়ম সহ্য করবে কেন ? অতএব বিকাশবাবুকে ঘেরাও করে বসল। চারদিকে, "জবাব চাই, জবাব দাও", এই সব ধ্বনি।

বিকাশবাবু বেলা বারোটা নাগাদ খেতে আসেন। কিন্তু একটা বেজে গেল, আসার আর নাম নেই। তাছাড়া ট্রেনের হুইসিল শোনা যাচ্ছে না। ঠিক সেই সময় স্টেশনের গ্যাংম্যান তারাপদ এসে জানাল, "মা, বাবুকে ভাত-তরকারি যা দেবার দাও, উনি আসতে পারবেন না। ঘেরাও হয়ে কপালে হাত দিয়ে বসে আছেন।"

"ওমা ! সে কী কথা !"

বারান্দায় বসে হারু তিন ভাইবোনের সঙ্গে মনোযোগ দিয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনছিল। শান্ত রেকর্ড-প্লেয়ার বন্ধ করে কানে-কানে কী যেন বলতেই হারু বারতিনেক লেজের ঝাপটা মারল মেঝেতে। তারপর দরজা ঠেলে রেললাইন ধরে ছুটতে শুরু করে দিল। ব্যস, ওকে দেখেই তো ঘেরাওকারীদের আত্মারাম খাঁচাছাড়া। কে আগে চোঁ-চা দৌড়ে জায়গা সাফ

করবে তারই যেন প্রতিযোগিতা। ফলে তারাপদকে আর টিফিন-কেরিয়ার টানতে হল না। ঘরে বসেই বিকাশবাবু দিব্যি ভাত খেলেন।

ইতিমধ্যে গ্রামে এক পাকা চোর ধরা পড়ল। চোরটি পাকা এই কারণে যে, মুখে কোন রা নেই। গ্রামে এক জাগ্রত শিবমন্দির আছে বহু প্রাচীনকালের। অষ্টধাতুর মূর্তি। লোকটাকে নাকি তারই কাছে ঘোরাফেরা করতে দেখা গেছে ক'দিন। এর উদ্দেশ্য জানতে গোটা গাঁয়ের লোক হিমশিম। যতই শাস্তি দাও, মুখে হালকা হাসিটি লেগে আছে। পেটের কথা টেনে বার করতে পুলিশ পর্যন্ত ফেল মেরে গেল এক সময়। খালি বলে, আমি শিবভক্ত। কিন্তু ভক্ত হলে পালাবার চেষ্টা করছিল কেন ? ফলে ওকে ধরে আনা হল হারুর কাছে।

চোরটি ভিন্ গাঁয়ের। ভেবেছিল, হারু বোধহয় কোনও মানুষের নাম। সুতরাং এখানেও ভক্তি-টক্তি দেখিয়ে পার পেয়ে যাবে। কিন্তু হারুর বিরাট চেহারা, ঝকঝকে করাতের মতো দাঁত,কাঁটা-বোঝাই লেজের ঝটপটানি দেখেই শক্ত চোর কান্নায় ভেঙে পড়ে, "বাবুরা,আর করব না, আমাকে ক্ষমা দাও, আমাকে ছেড়ে দাও, নাক মলছি, কান মলছি।"

পথে এসো বাপু। গড়গড় করে পেটের কথা বেরিয়ে আসে সব। নাম সৃষ্টিধর। গাঁয়ের নাম কাদাখোঁচা। পুরনো আমলের জাগ্রত অষ্টধাতু, কি পঞ্চধাতুর ঠাকুর-দেবতা চুরি করাই ওর পেশা। এতে ভাল পড়তা থাকে।

"কী রকম ?" বিকাশবাবু জিজ্ঞেস করেন।

"আজ্ঞে, কলকাতার এক সাহেব কিনে নেন ওই সব। তারপর উড়োজাহাজে বিদেশে চালান যায়।"

"ধরো, এই অষ্টধাতুটা বস্তায় পুরে ফেলতে পারলে কত দাম পেতে ?"

সৃষ্টিধর হেসে বলে, "তার কি ঠিক আছে বাবু। আবার পুরনো হলেই হবে না, জাগ্রত হওয়া চাই। দু'হাজার তিন হাজার পর্যন্ত দাম ওঠে এক-এক সময়।"

সৃষ্টিধরের সৃষ্টিছাড়া কথা শুনে সবাই অবাক। বিকাশবাবু কিন্তু হো-হো করে হেসে উঠলেন, "নিদ্রিত বলেই তো অষ্টধাতুটা আর একটু হলে আমেরিকায় চালান হয়ে যেত। আসল জাগ্রত হল আমার এই হারুচন্দ্র, কী বলিস তোরা ?"

সবাই মাথা নাড়ল, ঠিক কথা, ঠিক কথা।

ভিড়ের মধ্যে একজন চেঁচিয়ে উঠল, "হারাধন কি জয় !"

অন্যরা গলা মেলাল, "হারাধন যুগ-যুগ জিও।"

আগামী মাসে, অর্থাৎ ষোলোই জ্যৈষ্ঠ শান্ত, কান্ত আর খুকুর মামাতো বোন বকুলের বিয়ে। ওরা থাকে সুদূর বরানগরে। মামাতো ভাই কৌশিকদা কলেজে পড়ে। ভাল গাড়ি চালায়। বারকয়েক কৌশিকদা মুচকুন্দপুরে আসার ফলে হারুর সঙ্গেও দারুণ ভাব-ভালবাসা জমে গেছে। খুবই সাহসী। একবার তো কৌশিকদা হারুর মুখে আঙুল ঢুকিয়ে সব কটা দাঁত গুনে ফেলে। তাই দেখে খুকু তো কেঁদে সারা। যতই হারুদার সঙ্গে ভালবাসা থাকুক, কিন্তু মুখে হাত ঢোকাবার কথা চিন্তাও করা যায় না।

কৌশিকদা তখন খুকুর পিঠে হাত বোলায়। "বোকা মেয়ে, হারু আসলে মানুষ। শাপভ্রষ্ট হয়ে কুমিরকুলে জন্মেছে। কাঁদিস না বোন—"

তা হারুর মুখে আঙুল ঢোকানো থেকেই মালুম হয় কৌশিক কেমন দুঃসাহসী ছেলে। তার ওপর ওর মাথাটি

সর্বদা 'নতুন কিছু করো' এই চিন্তায় মশগুল। তা এবারের আইডিয়াটা দারুণ! শান্তকে চিঠি লিখেছে—

"বিয়ের ঠিক দু'দিন আগে আমি নিজে গিয়ে তোদের নিয়ে আসব। পিসেমশাইকে ছুটি নিতে বলবি। গাড়ি থাকবে, সুতরাং কোনও অসুবিধেই হবে না। আমরা বিয়েবাড়িতে মজা করব আর হারু একা-একা রেলের পুকুরে পড়ে থাকবে, এ হতেই পারে না। হারুও আসবে। ছাদের ওপর জলের ট্যাংকে ওর টেম্পোরারি শোবার ব্যবস্থা করেছি। ওর সকালের জলখাবার একদিন রসগোল্লা আর দুই ঝুড়ি লুচি। পেট না ভরলে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা। আমি বন্ধুদের কাছে হারুর গল্প খুব করেছি। সবাই ওকে দেখার জন্যে ব্যস্ত। ওর গায়ে একবারটি হাত বুলিয়ে সবাই ধন্য হতে চায়। আমার ইচ্ছে, বৌভাতের দিন হারুকেও নিয়ে যাব। হৈচৈ পড়ে যাবে। নতুন জামাই দেখার চাইতে হারুকে দেখতেই হুড়োহুড়ি হবে। পিসিমাকে বুঝিয়ে বলিস, হারুর কোনও কষ্ট হবে না। পাড়ায় একজন পশুপাখির ডাক্তার আছেন। তিনি অবশ্য কুমিরের চিকিৎসা করেননি। সেজন্য তিনি এখন কুমিরের মনস্তত্ত্ব এবং সাধারণ অসুখ ও তার প্রতিকার নিয়ে জোর পড়াশুনো শুরু করে দিয়েছেন। এই সঙ্গে হারুর নামেও আলাদা একটা বিয়ের কার্ড পাঠালাম। ওর চোখের সামনে দু'বার নাচালেই বুঝতে পারবে। ইতি তোদের কৌশিকদা।"

চিঠি পেয়ে তো মুচকুন্দপুরে হাসির ফোয়ারা উঠল। মা বললেন, "পাগলা ছেলের কাণ্ড দ্যাখো। বিয়েবাড়িতে যাবেন হারুকে নিয়ে!"

বাবা বললেন, "তা থাক, শখ হয়েছে যখন। তবে দিন-দিন হারুর চেহারাটা যা বদখত হচ্ছে, তাতে বিয়েবাড়ি ফেলে লোকজন না পালিয়ে যায়!"

মা রেগে উঠলেন, "মোটেই না, হারুর মুখে একটা আলগা শ্রী আছে।"

শান্ত বলে, "কৌশিকদার দারুণ বুদ্ধি। ঠিক ম্যানেজ করে দেবে দেখে নিও।"

কান্ত বলে, "কী মজা, গাড়ি করে যাব বরানগরে! আমি কিন্তু জানালার ধারে বসব, আগেই বলে দিচ্ছি।"

বিয়ের ঠিক দু'দিন আগে সকালবেলায় কৌশিক এল গাড়ি চালিয়ে। সঙ্গে পাড়ার এক বন্ধু পাঁচু। রেডিওতে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত গায়। সে কারণে সর্বদাই গুনগুন করতে থাকে। মা বললেন, "এসেই হুট করে চলে যাওয়া চলবে না। দুপুরে খেয়েদেয়ে যাবে।"

হারু তখন চাতালে বসে আপনমনে ঝিমুচ্ছিল। মা ওর পিঠে আলতো করে আদর করে বললেন, "যাও তো বাবা হারু, একটা ভাল দেখে মাছ নিয়ে এসো। অতিথি এসেছে।"

হারু এসব বেশ বুঝতে পারে। আড়মোড়া ভেঙে আস্তে-আস্তে রেলের পুকুরের দিকে চলে গেল। এই দেখে তো কৌশিকের বন্ধু পাঁচুর চোখ ছানাবড়া। কৌশিক বলে, "এতে অবাক হবার কিছু নেই রে। দাঁড়া, আগে মাছটা ধরে আনুক, তারপর অবাক হোস।"

মা বলেন, "সত্যিই, হারুই তো আমাদের ভরসা। পাড়াগাঁয়ে বাস করি, হঠাৎ কেউ এসে পড়লে বিপদ হত। এখন যত খুশি মাছ খাও!"

তা ঘন্টাখানেক বাদে মাছের ঝোলভাত খেয়ে ওরা বার হল হৈচৈ করে। বিকাশবাবু গেলেন না। ছুটি পাননি। অতএব মা'র যাওয়াও হল না। কৌশিক ড্রাইভারের আসনে। পাশে পাঁচু। তিন ভাইবোন পেছনের সিটে। পায়ের কাছে হারু। মা বারবার বলে দিলেন, "দেখো বাবা, হারুর যেন কোনও কষ্ট না হয়।"

"ঠিক আছে পিসিমা, কোনও চিন্তা নেই।" বলেই কৌশিক গাড়িতে স্টার্ট দিল।

হু-হু করে ছুটছে মোটর। দু' পাশে যত দূর চোখ যায় দোল-খাওয়া সবুজ ধানের খেত। দূরের গাছপালা পিছলে সরে যাচ্ছে কেবল। কালো পিচের রাস্তায় উল্কার বেগ। হলুদ রঙের একটা পাখি একবার ডেকে উঠেই আকাশ লক্ষ করে উড়ে গেল। সবাই তো আনন্দে আহা-উহু করছে। চুপ করে আছে শুধু শান্ত। হারুকে ঠিকমতো ফিরিয়ে আনা যাবে তো? বিয়েবাড়িতে হৈচৈ, লোকজন, আলোটালো দেখে যদি ঘাবড়ে যায়!

কলকাতা এসে গেল। এতক্ষণ রাস্তায় ওদের গাড়িটা ছিল। রাজার মতো। এখন অনেক গাড়ি। হোঁচট খেতে হচ্ছে। তাই বেগও আর নেই। বাতাস থেমে গেছে। বেজায় গরম। হারু বেচারা পায়ের নীচে উসখুস করছে। শত হলেও জলের জীব তো। কান্ত বলল, "দাদা, হারু ওপরে আসতে চাইছে!"

"তা ওকে জানলার কাছে নিয়ে বোস না," কৌশিক বলল, "আসলে ও কলকাতা দেখতে চাইছে। দেখুক।"

পা দিয়ে আলতো করে ধাক্কা দিতেই ওপরে চলে এল হারু। একবারে জানলার পাশে। মুখও বাড়িয়ে দিল। এবং শুরু হল বিপদ।

রাস্তার মোড়ে ট্রাফিক পুলিশ লরিওয়ালার কাছ থেকে কী যেন নেওয়ার জন্যে যেই না হাত বাড়িয়েছে অমনি সঙ্গে সঙ্গে এক কামড়। আচমকা কিম্ভূত মুখের কামড় খেয়ে পুলিশটা হাউমাউ করে মাথা ঘুরে পড়ে আর কি! রাস্তার লোকজনও ব্যাপারটা দেখে ফেলেছে। তারাও পড়িমড়ি দৌড়তে শুরু করল। মুহূর্তে ট্রাফিক জ্যাম। লণ্ডভণ্ড কাণ্ড। কৌশিক দেখল মহাবিপদ। সঙ্গে-সঙ্গে পাশের গলিতে গাড়ি ঢুকিয়ে অদৃশ্য। কিন্তু তাতেও কি নিস্তার আছে! এন্টালির মোড়ে সেই একই কাণ্ড। হারুর কামড় খেয়ে পুলিশটা যখন ছটফট করছে, সেই সুযোগে লরিওয়ালা হাসতে হাসতে উধাও। আবার লোকজনের চিৎকার, ছোটাছুটি, ট্রাফিক জ্যাম!

হারু তো মহাবিচ্ছু। কৌশিক ফের কায়দা করে গাড়ি ঢুকিয়ে দিল গলিতে। খানিক দূরে গিয়ে আয়নায় তাকিয়ে দেখে পেছনে পুলিশের গাড়ি। শুরু হল চোর-পুলিশ খেলা। কৌশিক অদ্ভুত কায়দায় ট্যাক্সির পাশ কাটিয়ে ঘুরে গেল ডান দিকের রাস্তায়। একটু পরে পুলিশের গাড়িও ডান দিকে। কৌশিক ক্রমাগত ধোঁয়া ছাড়ছে যাতে গাড়ির নম্বর না দেখা যায়। ফিসফিস করে বলল, "হারুকে সিটের তলায় চেপে রাখ, যত সব আপদ—"

বলতে বলতে ট্রাম রাস্তা। পুলিশের গাড়িও ট্রাম রাস্তায়। এবার আর নিস্তার নেই। রাগের চোটে শান্ত হারুর পিঠে মারল এক লাথি। সাপে তাড়া করলে যেমন এঁকেবেঁকে ছুটতে হয়, তেমনি কৌশিকও এ-গলি সে-গলি গলিতে গলিতে ছুটে ছুটে ক্লান্ত। কতবার যে অ্যাকসিডেন্টের হাত থেকে বেঁচে গেল তার সীমা নেই। আর একটু হলে গোটা-তিনেক লোক চাপা পড়ে যেত। তাহলে আর এক বিপদ। রাস্তাটা এবার একটু ফাঁকা। ফাঁকা রাস্তায় বিপদও অনেক। পুলিশ ধরে ফেলবে। বাঁ দিকে কেটে পড়াই ভাল। এই রে, আবার ট্রাফিক পুলিশ! কৌশিক চেঁচিয়ে উঠল, "শিগগির হারুর মুখটা চেপে রাখ—"

শান্ত বলল, "না না, উলটোপালটা কাজ না করলে হারু কিচ্ছু বলে না।"

"ওহ্! তোর হারু দেখি ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে বসেছে! আমার সব প্রোগ্রাম ভেস্তে গেল। ওকে কলকাতা আনাই ভুল।" কৌশিকের একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে।

ইতিমধ্যে আর এক ফ্যাসাদ। তেল ফুরিয়ে গেছে। কান্ত আর খুকু তো ভয়ে বিবর্ণ। বেচারাদের মোটরে চড়ার আনন্দই মাটি। ইঞ্জিনের গরমে হারুরও কাহিল অবস্থা। যতবার কলকাতা দেখবে বলে মুখ ওপরে তোলে ততবার শান্ত টেনে নামিয়ে দেয়।

পেট্রল পাম্পে তেল ভরতে গিয়ে কৌশিকের নজরে পড়ল সেই পুলিশের গাড়িটা হু হু করে বেরিয়ে যাচ্ছে। ব্যস, এবার উলটো দিকে গাড়ি হাঁকাও। শান্ত চেঁচিয়ে ওঠে, "যাদবপুর এসে পড়ল যে!"

তাই তো। রাস্তায় চরকিবাজি খাবার ফলে এই অবস্থা। কী উপায়! ওদিকে গেলে ফের পুলিশের তাড়া খেতে হবে। ভাবতে ভাবতে গড়িয়া। কান্ত বলল, "তাহলে বাড়িই চল, আর ভাল লাগছে না।"

শান্তও সমর্থন করল। বলল, "পুলিশ হারুকে সহজে ছেড়ে দেবে ভেবেছ! সব জায়গায় অয়ারলেসে খবর পাঠিয়ে দিয়েছে। সুতরাং বাড়িই ভাল। মুচকুন্দপুরে অন্তত পুলিশের ঝামেলা নেই।"

সবাই কথাটার তারিফ করল। এমনকী কৌশিকও। স্টিয়ারিং ঘোরাতে ঘোরাতে বেচারার হাত ব্যথা হয়ে গেছে। বলল, "হারুর মানুষ হতে এখনও অনেক দেরি। জোর ট্রেনিং দিতে হবে রে।"

কান্ত বলল, "আসলে কলকাতা দেখে ঘাবড়ে গেছে।"

খুকু কেঁদে উঠল, "দাদা, খিদে পেয়েছে।"

ঠিক কথা। সোনারপুর পেরিয়ে নিরালায় একটা ছোট মিষ্টির দোকানের সামনে গাড়ি থামিয়ে দশ টাকার রসগোল্লা কেনা হল। নিজেরা দুটো তিনটে করে খেয়ে হাঁড়িটা হারুর সামনে ধরতেই পলকে ফিনিশ। আহা, ওরও খিদে লেগেছিল দারুণ! শান্ত ভাবে, সকালে এক টিন রসগোল্লা, দুই ঝুড়ি লুচি বরাদ্দ ছিল। তা কপালে না থাকলে কী করবে!

মিষ্টির দোকানের ছোকরা জল দিতে একটু বুঝি এগিয়েছিল, হঠাৎ 'বাবা রে মা রে' বলে দৌড়। কৌশিকও স্টার্ট দিল গাড়িতে। আর ঝামেলা বাড়িয়ে কাজ নেই। এতক্ষণে পাঁচুর মুখে উচ্চাঙ্গের গুনগুন সুর বার হতে লাগল।

একটু পরেই মুচকুন্দপুর। বাবা-মা ছুটে এলেন, "কী ব্যাপার? কিছু আপদবিপদ হয়নি তো, হারু ভাল তো?"

শান্ত, কান্ত সংক্ষেপে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলে। কৌশিক বলল, "কলকাতাটা ওর সুট করেনি পিসেমশাই।"

"তা নয় রে," বিকাশবাবু বললেন, "আসলে হারু আমার হাতে তৈরি তো, তাই উলটোপালটা ব্যাপার একদম সহ্য করতে পারে না।"

আজকাল মা'র প্রাণটা জুড়ে থাকে হারু। শান্ত, কান্ত, খুকুর দিকেও বুঝি তেমন নজর নেই। বললেন, "আহা রে, হারুর পেটটা শুকিয়ে গেছে।" এই বলে হাঁড়িতে যত ভাত, বাটিতে যত ডাল ছিল সব বেড়ে দিলেন। হারুও চেটেপুটে খেল। তারপর রেলের পুকুরে ঝপাং। বিকাশবাবু বললেন, "আর ওকে ডিস্টার্ব কোরো না তোমরা। শরীরটা এবার ঠাণ্ডা হোক।"

স্বভাবকবি শান্ত ইতিমধ্যে একটা পদ্য লিখে ফেলেছে:

পুলিশের কালো হাতে
হারাধন সাদা দাঁতে
এঁকে দিল গাঢ় রক্তছাপ—
রসগোল্লা এক টিন
লুচি ঝুড়ি দুই-তিন
উবে গিয়ে মনটা খারাপ।

"বাঃ চমৎকার!" কৌশিকের ক্লান্তি যেন মুহূর্তে উবে যায়। "অ্যাই পাঁচু, এক্ষুনি কুম্ভীর রাগে সুর দিয়ে গলায় তুলে নে। দারুণ জমবে গানটা—"

পাঁচুও রেডি। চোখ বুজে গুনগুন করে, নি-নি-ধা-পা-মা-গা— পুলিশের কা-লো-হা-তে—

ছবি: জয়ন্ত ঘোষ

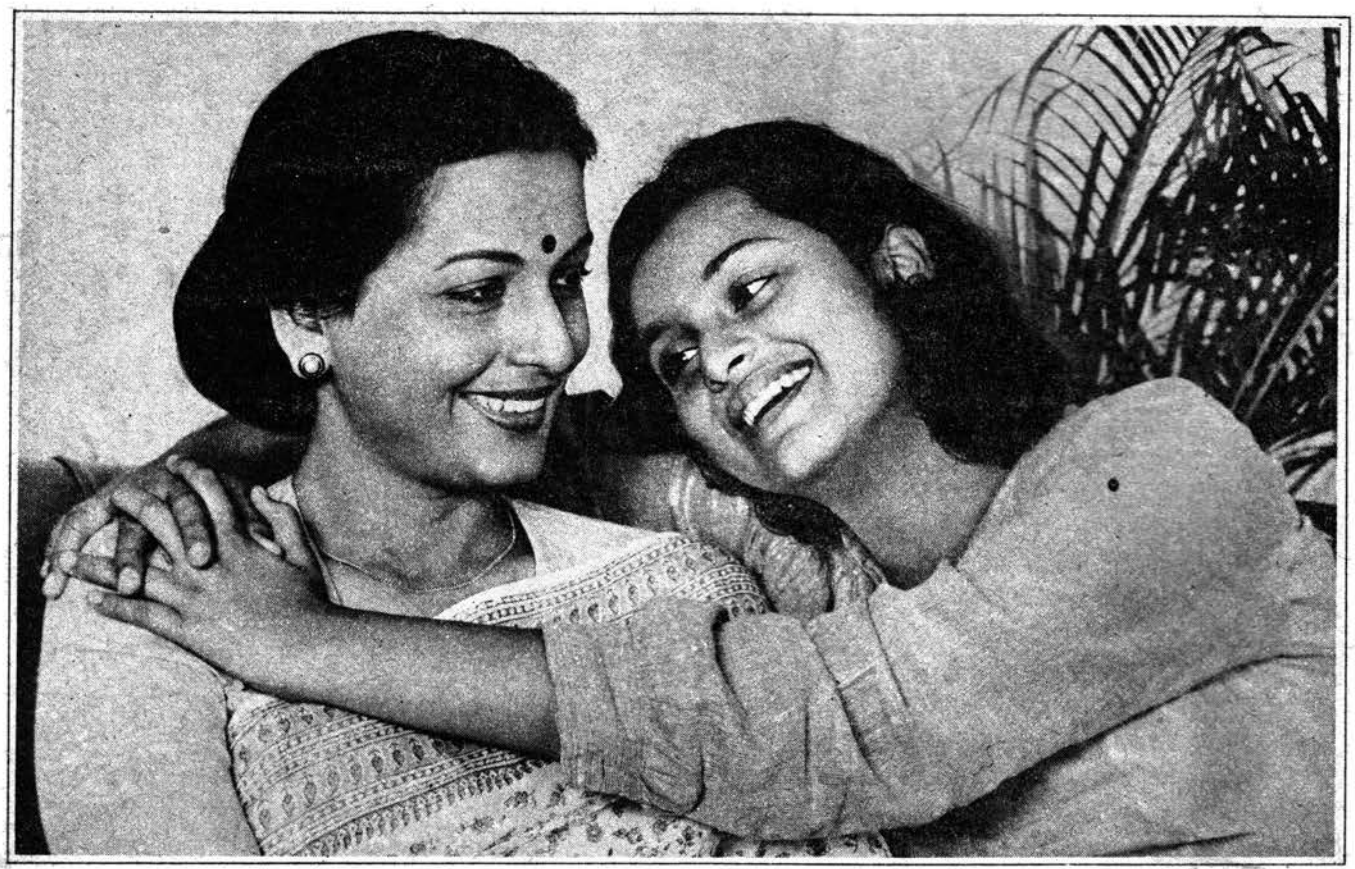

আমার মেয়ে এই শৈশব পার হল । মা হয়ে আমি বুঝি ওর পক্ষে এই সময়টা কত অস্বস্তিকর হতে পারে ।

"আমার মেয়ের জন্য কেন কেয়ারফ্রী বেছে নিলাম"

মা মাত্রেই জানেন, মেয়েদের সেই বয়সটা কীভাবে কাটে—যখন শৈশব ছাড়িয়ে সবে কৈশোরে পা দিচ্ছে । সেই অস্বস্তি আর দুশ্চিন্তার দিনগুলি ।

মা হয়ে আমি মেয়ের অবস্থা ভালভাবেই বুঝি । আমিও তো একদিন ওই বয়সেরই ছিলাম ! আমি তো জানি মাসের ওই ক'টা দিন কত অসুবিধা আর অনিশ্চয়তার মধ্যে কাটে ।

এতদিন আমি ঘরোয়া ন্যাপকিনেই কাজ চালিয়ে এসেছি—কিন্তু তার কাচাকুচি বড় সঙ্কোচের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় ।

এতদিন আমি ঘরোয়া ন্যাপকিনেই কাজ চালিয়ে এসেছি—তবে তার কাচাকুচি বড় সঙ্কোচের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় ।

তাতে আব্রু বলতে কিছু থাকে না । যেমন তাতে অসুবিধা, তেমনি অস্বস্তি । আর তাতে পুরোপুরি

নির্ভরতা তো পাওয়াই যায় না—তার উপর আবার কখন কী ঘটে যাবে, সবসময় সেই ভয় ।

অবশ্য এখন আমি ঘরোয়া ন্যাপকিনেই অভ্যস্ত । তা ছাড়া, আমাদের সময়ে এ নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কোনও লাভ ছিল না—কারণ ওই ক'টা দিন বাইরে বেরুনো ছিল একদম মানা ।

তবে দিন পাল্টাচ্ছে তো !···এখন মেয়েদের তো ওই ক'টা দিনেও কাজেকর্মে ব্যস্ত থাকতে হয় ।

তবে দিন পাল্টাচ্ছে তো ! কেয়ারফ্রীর সুরক্ষা যখন হাতের কাছেই মজুত, তখন আমার মেয়ে কেন আমার মতোই বোঝা বইবে ? ওর যুগ এখন আমাদের থেকে অনেক এগিয়ে গেছে । এখন মেয়েদের তো ওই ক'টা দিনেও হরেক কাজে ব্যস্ত থাকতে হয় । আমার মেয়ের কথাই ধরুন না—আমার সে-বয়সের তুলনায় ওকে সামাল দিতে হয় ঢের বেশি—যেমন পড়াশোনায়, তেমনি অন্য ব্যাপারেও । সবচেয়ে বড় কথা, আমি চাই যে, ও আমাদের মতো ঘরে বসে না-থেকে জীবনটাকে পুরোপুরি উপভোগ করুক ।

এই কারণেই তো আমি আমার মেয়ের জন্য কেয়ারফ্রী বেছে নিলাম । যাতে ও সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকে—যা-ই করুক না কেন । আর এ-বিষয়ে কেয়ারফ্রীর আশ্বাস আর কেই বা দিতে পারে ।

জানেন নিশ্চয়, কেয়ারফ্রী হল রেডিমেড ন্যাপকিন—যার ফলে এটা ব্যবহার করা আর বদলানো খুবই সহজ । মা হিসাবে আমার কাছে আরও বড় কথা এই যে, কেয়ারফ্রী হল পুরোপুরি স্বাস্থ্যসম্মত ।

কেয়ারফ্রী ব্যবহার করে আমার মেয়ে যাবতীয় বিড়ম্বনা,অসুবিধা আর অস্বস্তির হাত থেকে রেহাই পায় । যখন দরকার, তখনই নিয়ে নেয় একটা আনকোরা নতুন ন্যাপকিন ।

সত্যি কথা বলতে কী, এই রেডিমেড ন্যাপকিন কতটা কাজের হবে, সে-বিষয়ে আমার নিজেরই কিছুটা সংশয় ছিল । কিন্তু আমার মেয়ে তো বেশ কিছুদিন হল এটা স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করছে । সে বলে যে, কেয়ারফ্রী ব্যবহার করে সে অনেক বেশি নিশ্চিন্ত আর নিরাপদ বোধ করে—এমনকি বাড়ির বাইরেও । কাজেই ওকে নিয়ে এ-ব্যাপারে অন্তত আমার আর কোনও ভাবনা নেই ।

কেয়ারফ্রীর সুবিধা আমার মেয়ের জীবনকে এখন অনেক সহজ আর স্বচ্ছন্দ করে তুলেছে ।

আমি এখন সত্যি নিশ্চিন্ত আর সুখী । আমি এতেই খুশি যে, আমার মেয়েকে এমন-কিছু দিতে পেরেছি, যা আমরা নিজেরা ব্যবহার করবার সুযোগ পাইনি—কেয়ারফ্রীর সুবিধা, কেয়ারফ্রীর স্বাচ্ছন্দ্য । আসলে, সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলাই তো প্রগতি, তাই না ?

১০টির প্যাকে ও সাশ্রয়কারী ২০টির এবং ৩০টির প্যাকে পাওয়া যায়

এছাড়াও পাবেন, কেয়ারফ্রী এক্সট্রা লার্জ-এ ১০টির প্যাক

কেয়ারফ্রী স্যানিটারি ন্যাপকিন—
পরিবর্তনশীল যুগের উপযুক্ত সম্পূর্ণ স্বাচ্ছন্দ্য ও সুরক্ষা

Johnson & Johnson

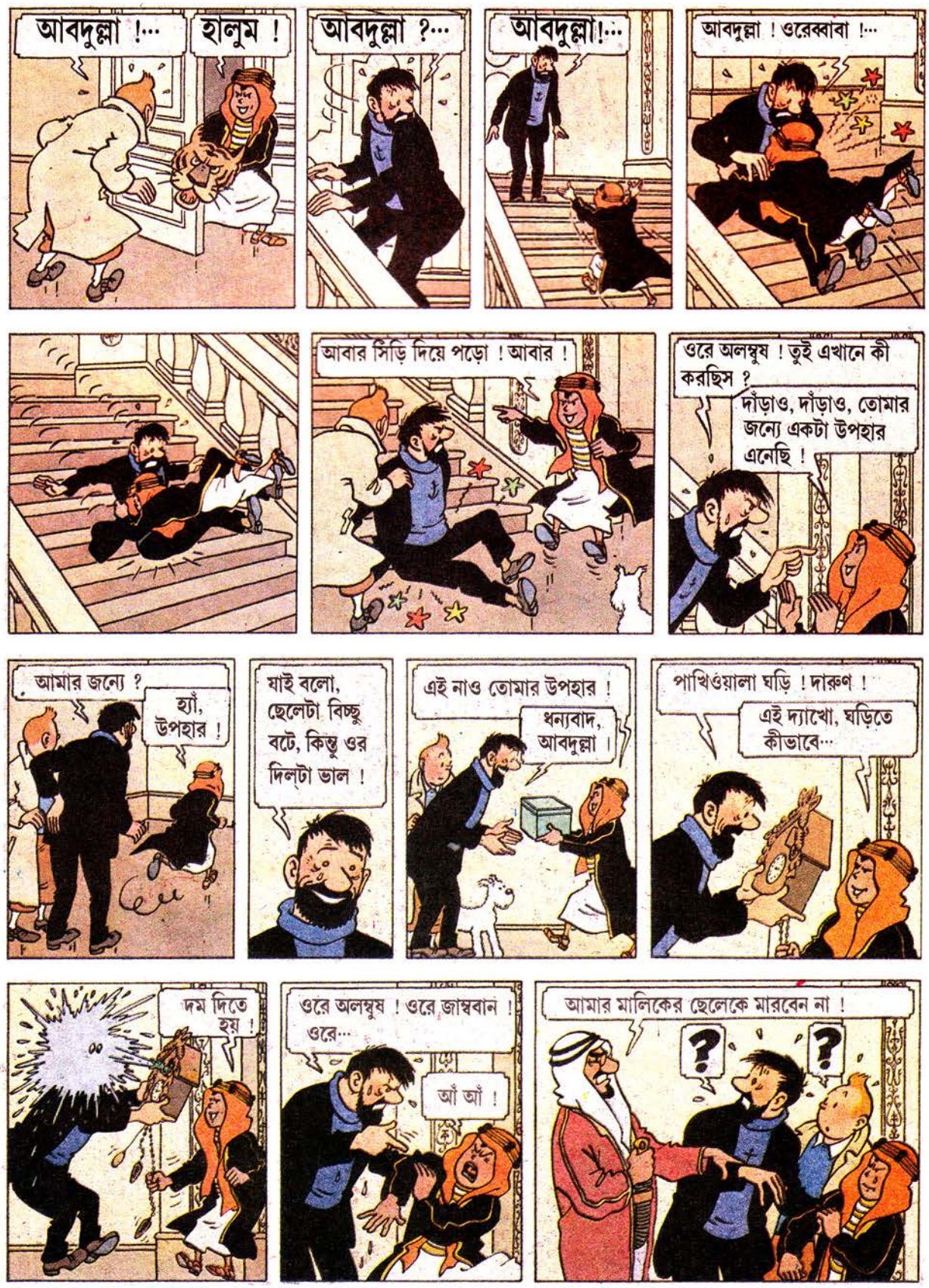
আবদুল্লা !···
হালুম !
আবদুল্লা ?···
আবদুল্লা!···
আবদুল্লা ! ওরেব্বাবা !···
আবার সিঁড়ি দিয়ে পড়ো ! আবার !
ওরে অলম্বুষ ! তুই এখানে কী করছিস ?
দাঁড়াও, দাঁড়াও, তোমার জন্যে একটা উপহার এনেছি !
আমার জন্যে ?
হ্যাঁ, উপহার !
যাই বলো, ছেলেটা বিচ্ছু বটে, কিন্তু ওর দিলটা ভাল !
এই নাও তোমার উপহার !
ধন্যবাদ, আবদুল্লা !
পাখিওয়ালা ঘড়ি ! দারুণ !
এই দ্যাখো, ঘড়িতে কীভাবে···
দম দিতে হয় !
ওরে অলম্বুষ ! ওরে জাম্ববান ! ওরে···
আঁ আঁ !
আমার মালিকের ছেলেকে মারবেন না !
?
?

লোহিত সাগরের হাঙর

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

রোভার্সের রয়

রয় আচমকা খেলোয়াড় পালটাল এই খেলায়···

কাঁকুরে জমিতে বল ঠিকমতো আসেনি···

রয় কি ওখান থেকে গোল পাবে ?

দেখা যাক, ব্ল্যাকিকে দিয়ে কাজ হয় কি না !

গো-ও-ও-ল !

যাচ্চলে !

মাথার পিছনে চোখ বসানো !

শাবাশ ব্ল্যাকি !

আবার হানা দিল ওল্ডফিল্ড···কিন্তু চার্লি তৈরি ছিল !

ধরো !

জোর বাঁচিয়েছে !

চার্লির হাঁটুর বারোটা বাজল !

সেকেণ্ড হাফে ওকে ট্র্যাক-সুট পরতে বলব !

বিরতির সময়···ড্রেসিং রুমে···

কী করছ তোমরা ?

ক্যাম্বিসের জুতো পরছি !

নইলে এঁটে উঠতে পারব না !

ওল্ডফিল্ড হয়তো নিজের ফাঁদে নিজেরাই পড়বে !

দ্বিতীয়ার্ধের খেলা চলছে···

এই গরমে খেলোয়াড়দের প্রাণান্ত !

গরম তো বেড়েই যাচ্ছে !

পনরো মিনিট বাদে রয় আবার বদলি-খেলোয়াড় নামাল !

ডানকান ম্যাকের জায়গায় নতুন খেলোয়াড় নামাচ্ছে !

এতে ওরা দুর্বল হয়ে পড়বে !

আবার আক্রমণে উঠেছে ওল্ডফিল্ড ! হেনিংয়ের পায়ে বল ! সামনেই গোল !

আ-আ-আ-আ !

কী হল ওর ?

লোকটা হঠাৎ থেমে গেল কেন ?

বল মাঝমাঠে ফেরত এল···

হোটেলের ওয়েটার !

সকলের হাতে বালতি !

ব্যাপার কী ?

কী ব্যাপার, তা কি কেউ আঁচ করতে পারছ ?

এর পরে আগামী সংখ্যায়

গোলমাল

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

আগে যা ঘটেছে : হরিবাবুকে একটা উটকো লোক জানায়, সে তাঁর স্বর্গত পিতা শিবু হালদারের কাছ থেকে আসছে। আপাতত লোকটার নাম পঞ্চানন্দ। সে নাকি উদ্ভট-বিজ্ঞানী শিবুবাবুর শাকরেদ ছিল। হরিবাবুর ছোট ভাই ন্যাড়া গজ-পালোয়ানের কাছে কুস্তি শেখে, আর-এক ভাই জরিবাবু শেখেন কালোয়াতি গান। পঞ্চানন্দ দুজনকেই ভূতের ভয় দেখায়। হরিবাবুর দুই ছেলে ঘড়ি ও আংটির ক্রীড়া-দক্ষতা দেখে হাতরাশগড়ের মহারাজা তাঁদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে চান। সন্দিগ্ধ দুই ভাই গাড়ির মধ্যে তাঁকে ঘায়েল করবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। পালিয়ে তারা যে-বাসে ওঠে, তার মধ্যে খুন হয় মহারাজার সেক্রেটারি। বাড়ি ফিরে তারা কাউকে কিছু জানায় না। গজ-পালোয়ানের আস্তানায় এদিকে একটা লোক এসে ঢোকে, এবং ঢুকেই মারা যায়। ভয় পেয়ে গজ-পালোয়ান পালায়। তারপর···

কবিতা শুনতে শুনতে পঞ্চানন্দ খুব বিকট এক একটা শব্দ করে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হাই তুলছিল। হরিবাবু বিরক্ত হয়ে বললেন, "আহা, অত শব্দ করলে কি চলে? কবিতা হল স্বর্গীয় জিনিস।"

বিনীতভাবে পঞ্চানন্দ বলল, "আজ্ঞে সে তো ঠিকই। কবিতার মতো জিনিস হয় না। এত মোলায়েম জিনিস যে কান দিয়ে ভিতরবাগে ঢুকে একেবারে বুকখানা জুড়িয়ে দিচ্ছে। ওই যে লিখেছেন লাইনটা 'ঘুম ঘুম ঘুম, ভূতের ঠ্যাং, বাদুড়ের ডানা, চাঁদের চুম' ওইটে শুনে এমন হাই উঠতে লেগেছে। ভাল জিনিসের মজাই এই। একবার রাজশাহির রাঘবসাই খেতে খেতে—খেয়েছেন তো? উরেব্বাস, কী যে সরেস জিনিস—হ্যাঁ তা খেতে খেতে এমন আরাম লেগেছিল যে খাওয়ার মাঝপথেই ঘুমিয়ে পড়লাম। নাক ডাকতে লাগল। শেষে একটা ইঁদুর এসে হাত থেকে বাকি আধখানা খেয়ে নেয়। তাই বলছিলাম আজ্ঞে, ভাল জিনিস পেলেই আমার বড্ড হাই ওঠে।"

হরিবাবু করুণ চোখে পঞ্চানন্দের দিকে চেয়ে বললেন, "কিন্তু ইয়ে, তুমি ঘুমিয়ে পড়লে যে আমার আর কবিতা পড়ার উৎসাহ থাকবে না।"

পঞ্চানন্দ খুব বিগলিত হয়ে দাঁত বের করে বলল, "তাহলে বরং গিন্নিমাকে বলে পাঠান, দু' কাপ বেশ জবর করে চা পাঠিয়ে দিতে। শীতটাও জাঁকিয়ে পড়েছে। জমবে ভাল। সঙ্গে এক-আধখানা নোনতা বিস্কুট-টিস্কুট হলে তো চমৎকার। চা আবার খালিপেটে খেতেও নেই। পেটে গরম চা গেলে আপনার কবিতার সাধ্যি নেই যে, পঞ্চানন্দকে হাই তোলাবে।"

অগত্যা হরিবাবু উঠে গিয়ে চায়ের কথা বলে এলেন।

নোনতা বিস্কুট দিয়ে চা খাওয়ার পর মিনিট দশেক জেগে রইল পঞ্চানন্দ। হরিবাবু নাগাড়ে কবিতা পড়ে চলেছেন। পঞ্চানন্দ দেয়ালে ঠেস দিয়ে ঘুম। তবে ঘুমের মধ্যেও পঞ্চানন্দ মাঝে মাঝে বলে যেতে লাগল, "আহা ··· বেড়ে লিখেছেন ··· চালিয়ে যান ···।" তারপর হঠাৎ ঘুম ভেঙে সোজা হয়ে বসে বলল, "দাঁড়ান, দাঁড়ান, একতলা থেকে কে যেন ডেকে উঠল!"

হরিবাবু পড়া থামিয়ে অবাক হয়ে বললেন, "কই, আমি শুনিনি তো!"

পঞ্চানন্দ মাথা নেড়ে বলল, "নির্ঘাত ডেকেছে। ওই যে শুনুন।"

বাস্তবিকই শোনা গেল নীচে থেকে বাচ্চা-চাকরটা হাঁক মারছে "বাবুরা, সব খেতে চলে আসুন। মা-ঠাকরোন ডাকছেন।"

পঞ্চানন্দ একগাল হেসে বলল, "শুনলেন তো! এ হল পঞ্চানন্দর কান। সেবার তো কৈলাস থেকে ভূতেশ্বরবাবা ডাক দিলেন আর আমি সে-ডাক গঙ্গোত্রীতে বসে শুনে ফেললুম। শিবুবাবুও বলতেন, 'ওরে পঞ্চা, তোর কান তো কান নয়, যেন টেলিফোন।' তা আজ্ঞে গিন্নিমা যখন ডাকছেন তখন আর দেরি করা ঠিক নয়। খবর নিয়েছি আজ খাসির তেলের বড়া হয়েছে এ-বেলা। গরম খেলে অমৃত, ঠাণ্ডা হলে গোবর। দেরি করাটা আর একদমই উচিত হবে না।"

হরিবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কবিতার খাতা বন্ধ করে বললেন, "তোমার কান সত্যিই খুব সজাগ।"

যাই হোক, খাওয়াদাওয়া মিটতে একটু রাতই হয়ে গেল। পঞ্চানন্দ যা খেল তা আর কহতব্য নয়। তবে কিনা গিন্নিমা অর্থাৎ হরিবাবুর স্ত্রী তাকে খুব অপছন্দ করছিলেন না।

পঞ্চানন্দ এগারোটা খাসির তেলের বড়া শেষ করে যখন মাংসের ঝোল দিয়ে একপাহাড় ভাত মাখছে তখন গিন্নিমা সামনে এসে দাঁড়িয়ে কোমরে হাত দিয়ে তার খাওয়া দেখতে দেখতে বললেন, "এই খিদেটা পেটে নিয়ে এতকাল কোথায় ছিলে?"

পঞ্চানন্দ লজ্জা-লজ্জা ভাব করে বলল, "আজ্ঞে পাহাড়ে কন্দরেই কাটছিল আর কি! টানা বছর-দুই নিরম্বু উপোস। পাহাড়িবাবার হুকুমে দেড় বছর একটানা এক ঠ্যাঙে দাঁড়িয়ে সাধনা করতে হল। তারপর···"

গিন্নিমা চোখ পাকিয়ে বললেন, "আমি তো কর্তাবাবুর মতো কবি নই, পাগলও নই যে, যা-খুশি বুঝিয়ে দেবে। তোমার মতো হাড়হাভাতেদের আমি খুব চিনি। মিথ্যে কথা বললে দূর করে তাড়িয়ে দেব। বলি হাতটানের অভ্যেস নেই তো?"

পঞ্চানন্দ একটু মিইয়ে গিয়ে মিনমিন করে বলল, "খুব অভাবে পড়লে ওই একটু-আধটু। বেশি-কিছু নয়, এই ঘটিটা-বাটিটা··· সত্যি বলছি।"

"থাক, আর কিরে কাটতে হবে না। শোনো, এই বলে রাখছি, এ বাড়িতে থাকতে চাও থাকবে, দুবেলা দুটি করে খেতেও পাবে। তবে তার বদলে শক্ত কাজ করতে হবে। বসে খেলে চলবে না।"

পঞ্চানন্দ কাজের কথায় খুব নরম হয়ে গিয়ে বলল, "আজ্ঞে

আমার হল ননির শরীর। বেশি কাজটাজ আমার আসে না।"

"তা বললে তো হবে না। কাজ না করলে সোজা বাড়ি থেকে বের করে দেব। তবে এও বলি বাছা, কাজ শক্ত হলেও বেশি পরিশ্রমের নয়। এ বাড়ির কর্তাবাবুর বড় কবিতা লেখার বাতিক। কেউ শুনতে চায় না বলে ভারী মনমরা হয়ে থাকেন। খবরের কাগজের লোকগুলোও কানা, কেউ ছাপতে চায় না। তা এবার থেকে বাবুর কাছে-কাছে থাকবে। আর কবিতা শুনবে। পারবে তো!"

পঞ্চানন্দ একটা বিষম খেল। তারপর ঘটি আলগা করে খানিক জল গিলে নিয়ে বলল, "তা···তা পারব'খন। তবে কিনা মা-ঠাকরোন, এই বিড়িটা আশটা কিংবা একটু গরম চা, মাঝে-মাঝে চুল ছাঁটা আর দাড়ি কামানোর পয়সা···"

"ইঃ, আম্বা দ্যাখো, আচ্ছা সে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা যাবে। কর্তাবাবুর তোমাকে বেশ ভাল লেগেছে বলেই তোমাকে রাখছি। নইলে···"

পঞ্চানন্দ সপাসপ ঝোলমাখা ভাত খেতে খেতে বলল, "নইলে কী তা আর বলতে হবে না মা-ঠাকরোন। পঞ্চানন্দকে আজ অবধি কেউ ভাল চোখে দেখেনি। অবিশ্যি তাদের দোষও নেই।"

"আর শোনো, মিথ্যে কথাটথাগুলো একটু কম করে বোলো। তুমি নাকি আমার শ্বশুরমশাইয়ের বন্ধু ছিলে বলে বলেছ?"

জিব কেটে পঞ্চানন্দ বলে, "ছিঃ ছিঃ, বন্ধু বললে আমার জিব খসে পড়বে যে। তবে কিনা শিবুবাবু আমাকে খুব স্নেহ করতেন। বাপে-তাড়ানো মায়ে-খেদানো বাউণ্ডুলে তো আমি, তাই তাঁর জাদুই-ঘরের বারান্দায় থাকতে দিয়েছিলেন। ওরকম মানুষ হয় না।"

"আর তুমি নাকি একটা চাবি দিয়েছ কর্তাবাবুকে, সে-চাবি কিসের চাবি?"

পঞ্চানন্দ বাঁ হাতে মাথা চুলকে বলল, "আজ্ঞে মা-ঠাকরোন, আপনার কাছে মিথ্যে কথা বলে কোন্ আহাম্মক? চাবিটা কিসের তা আমিও জানি না। তবে শিবুবাবু···"

গিন্নিমা চোখ পাকিয়ে বললেন, "দ্যাখো পঞ্চানন্দ, আমাকে তোমার কর্তাবাবুর মতো গোলা লোক পাওনি। আমার শ্বশুরমশাইয়ের সঙ্গে তোমার ভাব থাকলে এখন তোমার কত বয়স হওয়ার কথা জানো?"

পঞ্চানন্দ খুব ভাবনায় পড়ে গিয়ে বলে, "আজ্ঞে বয়সটাও আমার নেহাত ফেলনা নয়। তা বলতে নেই বয়স তো গিয়ে সেই···"

"থাক, থাক, তোমার ওষুধ আমার জানা আছে। এখন খাও, খেয়ে নিজের বাসন মেজে জায়গা পুঁছে ল্যাবরেটারির বারান্দায় গিয়ে শুয়ে থাকো।"

গিন্নিমা চলে যাওয়ার পর পঞ্চানন্দ রাঁধুনিকে ডেকে গম্ভীরভাবে বলল, "লেখাপড়া জানার ঝক্কি অনেক, বুঝলে? লেখাপড়া না শিখে খুব ভাল কাজ করেছ। আমি একটু বেড়াতে এসে কেমন ফেঁসে গেলুম দ্যাখো, বাবুর হয়ে এখন নানারকম লেখা-টেখার মুসাবিদা করতে হবে। মাথার খাটুনিটাও কিছু কম হবে না। কাল সকাল থেকে আমাকে এক গেলাস করে গরম দুধ দিও তো। আর একটা কথা, আমার কাছে একটা পোঁটলা আছে। বেশি কিছু নেই তাতে। পড়তি জমিদার বংশ তো, বেশি কিছু ছিলও না। ভরি পাঁচ সাত সোনার গয়না, কয়েকটা মোহর আর বোধহয় দশ বারোখানা হিরে, তিন চারটে মুক্তো এই সব আর কি। পোঁটলাটা তোমার কাছে গচ্ছিত রাখব। একটু লুকিয়ে রেখো। কেমন?"

রাঁধুনি একটু বোকা-সোকা লোক। সহজেই বিশ্বাস করে বলল, "যে আজ্ঞে। তা আপনি ক'দিন আছেন এখানে?"

"দেখি রে ভাই। যতদিন হিমালয় আবার না টানে ততদিন তো থাকতেই হচ্ছে। আর এঁরাও ছাড়তে চাইছে না। কেন বলো তো?"

রাঁধুনি মাথা চুলকে বলল, "না, ভাবছি কাল থেকে দু'বেলাই কয়েক খুঁচি চাল বেশি করে নিতে হবে। আজ রাতে আমাদের ভাতে টান পড়েছে। আপনি বেশ খান।"

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে পঞ্চানন্দ বলল, "সেই খাওয়া আর কোথায় রে ভাই। আর খাবই বা কী দিয়ে? কাল যদি একটু ভালমন্দ রাঁধো তো খাওয়া দেখাব, দেখলে ট্যারা হয়ে যাবে।"

"আজ্ঞে ভালমন্দ তো আজ কিছু কম হয়নি।"

"দূর পাগলা, মাংস, খাসির তেলের বড়া, ভাজা মুগের ডাল মাছের মাথা দিয়ে, ফুলকপির পোড়ের ভাজা, পটলের দোলমা এ আর এমন কী? এর সঙ্গে চিতল মাছের পেটি, ইলিশ ভাপা, কুচো মাছের টক, মুরগির কালিয়া, পায়েস আর কাঁচাগোল্লা হত তো দেখতে ভোজবাজি কাকে বলে।"

পঞ্চানন্দ আঁচিয়ে এসে বাড়ির কাজের লোকটিকে ডেকে বলল, "থালাটা ভাল করে মেজো। নোংরা কাজ একদম পছন্দ করি না।"

এই বলে সে সোজা গিয়ে জরিবাবুর ঘরে হানা দিল।

"এই যে জরিবাবু, হবে নাকি একখানা দরবারি কানাড়া? রাতটা বেশ হয়েছে। এই বেলা ধরে ফেলুন।"

জরিবাবু করুণ স্বরে বললেন, "ধরব, আবার যদি কেউ তারা চলে আসে গান শুনতে?"

"ভয় কী? আমি তো আছি। নাঃ, আজ বড় চাপনো খাওয়া হয়েছে। আজ বরং থাক। কাল হবে। তা আমার বিছানাটা কোন্ দিকে হবে?"

জরিবাবু তাড়াতাড়ি উঠে কম্বল চাদর আর বালিশ দিয়ে বললেন, "মেঝেয় শুতে কি আপনার খুব কষ্ট হবে?"

"নাঃ, হিমালয়ে তো বরফের ওপরেই শোওয়া-টোওয়া চলত। কষ্ট কিসের?"

পঞ্চানন্দ বেশ ভাল করে বিছানা পেতে শুয়ে বলল, "বাতিটা নিবিয়ে আপনিও শুয়ে পড়ুন। সকালে আবার গলাটলা সাধতে হবে।"

জরিবাবু বাধ্য ছেলের মতো শয্যা নিলেন।

আস্তে-আস্তে দু'জনেই ঘুমিয়ে পড়ল। রাত্রি নিঝুম হয়ে গেল।

কিন্তু মাঝরাতে আচমকাই ঘুম ভেঙে চোখ চাইল পঞ্চানন্দ। (ক্রমশ)

মচকানির ব্যথার চোটে ও কি উঠতে পারছে না?

ব্যথা উপশমের গুণ তো আপনার হাতেই!

আপনার দরদী হাতের পরশ আর আয়োডেক্সের উপশমের শক্তির চমৎকার – ওর দুই-ই দরকার। তাই, আয়োডেক্স সবসময়ে হাতের নাগালেই রাখুন। কারণ, আয়োডেক্সে আছে আয়োডিনের গুণ, যা জখম টিস্যুকে সারিয়ে তোলে আর আছে মিথাইল স্যালিসিলেট, যা ব্যথা-বেদনার জড়কে নির্মূল করে।

আয়োডেক্স লাগালে দিনে দু'বার, দু'গুণ কাজে চমৎকার

ডাক্তারদের মতে ব্যথা-বেদনা পুরো কমে না যাওয়া পর্যন্ত, আয়োডেক্স লাগানো উচিৎ দিনে দু'বার ··· এবং ব্যথা কমার পরেও আরো কয়েক দিন ·· ব্যথা হ'ল উপসর্গ মাত্র, বেদনার আসল কারণ হ'ল জখম টিস্যু।

সুতরাং আপনার প্রিয়জন যখন-ই মচকানি, পেশীর খিঁচ ধরা, গাঁটের আড়ষ্টতা বা দেহের ব্যথা-বেদনার চোটে কষ্ট পাবে, তখনই আপনার হাতের পরশে, তালতো মালিশে আয়োডেক্স লাগান – দিনে দু'বার। আর দেখুন, ওরা কেমন দু'গুণ চট্‌পট্‌ সেরে চাঙ্গা হয় আর আপনার দরদী হাতের গুণ গায়।

আয়োডেক্স® – ব্যথা উপশমের গুণের শক্তিতে ভরপুর খাস বাম

SKOF – এক এসকেএফ উৎপাদন

ELL-1509

শয়তানের চোখ

সমরেশ মজুমদার

আগে যা ঘটেছে: সুপ্রকাশ চা-বাগানের কর্তা। ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে তাঁর স্ত্রী কুমুদিনী সারা জীবনের মতো পঙ্গু। স্কুল ছুটি হয়ে যাওয়ায় তাঁদের ছেলে সায়ন এখন চা-বাগানেই আছে। বাংলোর হাতায় একজোড়া সাপ মারা হয়েছে। বুধুয়া-বুড়ো তাতে অখুশি। কাছেপিঠে ডাকাতি হচ্ছে। রাত্রে দূরের পাহাড়ে সাংকেতিক আগুন জ্বলে। কাজের লোক বকুলের বিশ্বাস, সাপের গর্ত খুঁড়লে মণি মিলবে। সায়ন গিয়ে বুধুয়া-বুড়োর কাছে সাংকেতিক আগুনের অর্থ জেনে নেয়। তারপর···

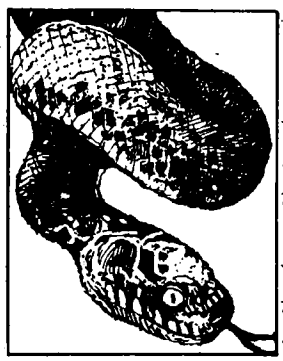

পাক খেতে খেতে ধুলোর ঝড় এগিয়ে আসছে। তারপরেই চোখে পড়ল আগে আগে বিদ্যুতের মতো ছুটে আসছে একটা ঘোড়া, আর ঘোড়াটা যে নীলাম্বর তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

সায়ন চিৎকার করে উঠল। নীলাম্বরকে কখনও সে ওই রকম পাগলের মতো ছুটতে দেখেনি। ঘাস কাটছিল বুধুয়া-বুড়ো। চিৎকার শুনে চমকে তাকাল। সায়ন বলল, "বুধুয়া-বুড়ো, নীলাম্বর ছুটে আসছে, একা একা।"

"একা একা ? বড়াসাহেব নেই ?" বিস্মিত বুধুয়া-বুড়ো উঠে দাঁড়াল, তারপর চোখের ওপর হাতের ছাউনি দিয়ে দেখার চেষ্টা করতে লাগল। সুপ্রকাশের প্রসঙ্গটা মনে করিয়ে দেওয়ায় ছ্যাঁত করে উঠল সায়নের বুক। নীলাম্বর বাবাকে পিঠে নিয়ে বেরিয়েছিল চা-বাগানের সরু পথে টহল দেবার জন্যে। নীলাম্বরের একা ফিরে আসা মানে বাবা কোনও দুর্ঘটনায় পড়েছে নিশ্চয়ই।

"ও নীলাম্বর না, কিছুতেই না।" আচমকা চিৎকার করে উঠল বুধুয়া-বুড়ো।

আবার চমকে উঠল সায়ন। নীলাম্বর নয় ? এই তল্লাটে আর কারও ঘোড়া নেই। তা হলে এই ঘোড়াটা কোত্থেকে এল ? সায়ন ততক্ষণে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। যেটা বুধুয়া-বুড়ো দূর থেকেই বুঝতে পেরেছিল, সেটা এখন তার কাছে ধরা পড়ল। যে ঘোড়াটা আসছে, সেটা নীলাম্বরের চাইতে খাটো, পিঠে জিন চাপানো নেই, এবং গায়ের রঙ সবুজ। ঘোড়াটা এমনভাবে ছুটে আসছে, যেন মৃত্যু ওকে তাড়া করেছে। পেছনে ধুলোর ঝড় থাকায় ওর উপরে কেউ আছে কি না, ঠাহর করা যাচ্ছে না। হঠাৎ বুধুয়া-বুড়ো চিৎকার করে উঠল, "এ নিশ্চয়ই শয়তানের ঘোড়া, শয়তানের ঘোড়া, রেতি নদী থেকে উঠে এল। চোখ বন্ধ করো, চোখ বন্ধ করো ছোটাসাহেব।"

ঘোড়া এবার সামনাসামনি। ছুটতে-ছুটতে ওদের দেখে মুখ ঘুরিয়ে দিক বদল করতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। ততক্ষণে ধুলোর ঝড়টা গিলে ফেলল সায়নদের। মুহূর্তেই পৃথিবীটা অন্ধকার হয়ে গেল। সায়ন শুধু শুনতে পেল বুধুয়া-বুড়ো চিৎকার করছে, "ছোটাসাহেব, মুখে হাত দিয়ে বসে পড়ো উবু হয়ে।"

সায়ন বসে পড়ল।

হঠাৎ খিলখিল হাসি কানে আসতে চোখ খুলল সে। বুধুয়া-বুড়ো দুলে দুলে হাসছে। ওকে দেখে তার নিজেরই হাসি পেয়ে গেল। মাগুরমাছের শরীরে ছাই লাগালে ওইরকম দেখায়। ধুলোয়-ধুলোয় বুধুয়া-বুড়োকে সার্কাসের জোকার বলে মনে হচ্ছে। এবং তখনই তার মনে হল, বুধুয়া-বুড়ো যখন তাকে দেখে অমন হাসছে তখন সে-ও রক্ষা পায়নি। মাথার চুল, চোখের পাতা বোধহয় সাদাটে হয়ে গেছে। ধুলোর ঝড়টা এখন চা-বাগানের মধ্যে দিয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ খেয়াল হতেই সে চটপট ঘুরে দেখল, নতুন ঘোড়াটা নেই। ডাইনে বাঁয়ে কোথাও তাকে দেখা গেল না। অথচ সামান্য আগে ওটা থমকে দাঁড়িয়েছিল। বুধুয়া-বুড়োরও বোধহয় খেয়াল হয়েছে। কারণ সে ফিসফিসিয়ে বলল, "শয়তানের ঘোড়া নির্ঘাত শয়তানের ঘোড়া। এই দেখা দেয়, এই হাওয়া হয়। মুখ খুললেই আগুন বেরোয়। পালাও ছোটাসাহেব। জায়গাটা খারাপ হয়ে গেছে। এ-ধুলো কিসের ধুলো কে জানে!"

"শয়তানের নিজের ঘোড়া আছে নাকি ?" বিরক্ত সায়ন তখন চারদিকে খুঁজছিল ঘোড়াটার হদিস। তার সন্দেহ হল, রেতি নদীর দিকে একটা গাছের নীচে কিছু নড়ছে। ওটা ঠিক ঘোড়া কি না এত দূর থেকে ঠাহর করা যাচ্ছে না।"

"শয়তানের কী নেই ? ভগবানের যা যা আছে, শয়তানেরও তাই আছে। এসব নিয়ে সন্দেহ করারও কোনও কারণ নেই। আর আমাদের ওসব নিয়ে ভাবতে যাওয়ার কী দরকার। ঘোড়াটা নীলাম্বর নয়, ব্যস চুকে গেল। খুব বদ হাওয়া বইছে, এখন ভালয়-ভালয় বাংলোয় ফিরে যাওয়াই ঠিক কাজ হবে।" বুধুয়া-বুড়ো তার জিনিসপত্র গুছিয়ে নিতে-নিতে কথাগুলো বলছিল।

"তুমি বাংলোয় ফিরে যাও, আমার দেরি হবে।"

"দেরি হবে ? দেরি হবে কেন ?"

"আমি ওই ঘোড়াটাকে খুঁজব।"

"হায় কপাল। বললাম ওটা শয়তানের ঘোড়া। এই দেখবে সামনে দাঁড়িয়ে, চোখ সরাবার আগেই উধাও। ওকে কেউ খুঁজতে চায়। চলো।"

সায়নের জেদ চেপে গেল। শয়তানের ভেলকিবাজি বলে কিছু কি থাকতে পারে ? বাবা বলেছিলেন, বিজ্ঞানের যুগে এইসব বুজরুকির কথা শোনাও অন্যায়। কিন্তু বুধুয়া-বুড়োর উদ্বিগ্ন মুখের দিকে তাকিয়ে সে হেসে ফেলল। এখন সে হাজার বোঝালেও এই মানুষটিকে বোধে ফেরাতে পারবে না। সে বাধ্য ছেলের মতো বুধুয়া-বুড়োর সঙ্গী হল। বুধুয়া-বুড়ো একটু খুশি হল। পাশাপাশি হাঁটতে-হাঁটতে সে বলল, "আজ সন্ধে থেকেই বাংলোর চারপাশে আগুন জ্বালাতে হবে। বড়াসাহেবকে রাজি করাতেই হবে। বুঝলে ?"

"কেন ?"

ওর দাঁতকে এখন থেকেই সুরক্ষিত করে নিন

এই ফ্লোরাইড সংরক্ষণ একে বিনাকা ফ্লোরাইড দিয়ে করুন

দাঁতকে জীবনভর সঙ্গী ক'রে নিতে হ'লে, দন্তছিদ্রের সংরক্ষণ করুন আর, বিনাকা ফ্লোরাইড-এর ফ্লোরাইডই দেয় ঐ অপরিহার্য সংরক্ষণ। কারণ, মুখের ভেতরের ক্ষতিকর অ্যাসিড যখন দাঁতের তলার ভাগকে ঘিরে ফেলে, তখন এই ফ্লোরাইড, দাঁতের এনামেলের সঙ্গে মিশে গিয়ে দন্তছিদ্র হওয়া রোধ করে—আর, ফলে, প্রাথমিক অবস্থাতেই দন্তক্ষয় হওয়াও রোধ হয়।

তাই বিনাকা ফ্লোরাইড দিয়ে, দন্তছিদ্র হওয়া বন্ধ করুন, দন্তক্ষয় রোধ করুন।

দাঁতে নব জীবনের সাড়া

বিনাকা ফ্লোরাইড টুথপেস্ট

ভারতের সর্বপ্রথম ও প্রভাবশালী ফ্লোরাইড টুথপেস্ট

ULKA-HCG-BF-10-85-BENG

"শুধু আগুন দেখেই শয়তান ভয় পায়।"

"কিন্তু তুমি বলেছিলে শয়তানেরও নিজের আগুন আছে। তা হলে সে আর ভয় পাবে কেন?"

"সে-আগুন আর এই আগুন এক নয়। সে-আগুনে হাত পোড়ে না, সেটা আগুনের মতন, কিন্তু সত্যিকারের আগুন নয়।" কথাটা শেষ করে নিজের মনে বিড়বিড় করতে লাগল বুধুয়া-বুড়ো।

ওরা বাংলোর সামনে ফিরে আসতেই দেখতে পেল, বকুল রোদ্দুর মাথায় করে লনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বুধুয়া-বুড়োকে সেই কথা বলা মাত্র তার বৃদ্ধ শরীর যুবকের মতো দ্রুতগামী হল। গেট খুলে সে ভেতরে ঢুকে যেতেই সায়ন দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর কেউ তাকে লক্ষ করছে না বুঝতে পেরে উল্টোদিকে দৌড় শুরু করল। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই সে চা-বাগানের মধ্যে ঢুকে গেল। এখান থেকে সে তাদের বাংলোটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, কিন্তু ওখান থেকে কেউ তাকে আবিষ্কার করতে পারবে না।

চারপাশে এত ধুলো যে, হাঁটু পর্যন্ত সাদা হয়ে গিয়েছে। সায়ন সেই ধুলোয় দাঁড়িয়ে চারপাশে খুঁজতে লাগল। শেষ যে-জায়গাটায় ঘোড়াটাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল বলে সন্দেহ হয়েছিল, সেখানে কিছু নেই। সায়ন নিঃশব্দে এগিয়ে যেতে-যেতে একটা নতুন জিনিস আবিষ্কার করল। এই যে সে চুপচাপ একটা গাছ কিংবা পাথরের মতো দাঁড়িয়ে আছে, এরকম তো কখনও করেনি। ঘরে এত বিচিত্র আওয়াজও কখনও কানে আসেনি। গাছের পাতা যখন নড়ে, তারও একটা ফিসফিসানি আছে, ফড়িং যখন এ-ডাল থেকে লাফিয়ে ও-ডালে যাচ্ছে, তারও একটা আওয়াজ আছে। এই জগৎটা মানুষের কাছে অজানা থাকে, এতকাল সায়ন নিজেও জানত না। ক্রমশ তার মনে হচ্ছিল, এই চা-গাছের বাগান, শেড্-ট্রির সঙ্গে সে নিজে মিশে গেছে, আলাদা কোনও অস্তিত্ব নেই।

সন্তর্পণে এগিয়ে যেতে যেতে সে চা-বাগানের শেষপ্রান্তে পৌঁছে গেল। এখান থেকেই জঙ্গল শুরু। জঙ্গলটা নেমে গেছে রেতি নদীতে। রেতির ওপার থেকেই ভুটান পাহাড়ের শুরু। সায়ন পিছন ফিরে তাকাল। তাদের এই চা-বাগানটা জনশূন্য, এবং চুপচাপ পড়ে আছে খাঁখাঁ রোদে। এখান থেকে তাদের বাংলোটা আর দেখা যাচ্ছে না। সায়ন ঘোড়াটার কোনও হদিস পাচ্ছিল না। একটা জলজ্যান্ত ঘোড়া ধুলোর ঝড় ছুটিয়ে এসে উধাও হয়ে যেতে পারে না।

সায়ন জঙ্গলের মধ্যে পা বাড়াল। মানুষ না করলেও প্রকৃতি অদ্ভুত কায়দায় কিছু পথ তৈরি করে দেয় জঙ্গলে হাঁটা-চলার জন্যে। সায়নের খুব মনে হচ্ছিল, ঘোড়াটা বেশি দূরে যায়নি। কারণ দূরে গেলে দৌড়ে যেত। আর তা হলেই ধুলোর ঝড় উঠত খুরের ধাক্কায়। হাঁটতে-হাঁটতে সে প্রায় রেতি নদীর কাছে যখন পৌঁছে গেছে, তখন জলের শব্দ পেল। কুলকুল শব্দটা একটানা বেজে যাচ্ছে। জঙ্গল সরিয়ে চোখ মেলতেই সে নদীটাকে দেখতে পেল। আশিভাগ শুকনো খটখটে। বোল্ডার আর ছোট পাথর ধুলোময় হয়ে রয়েছে। বর্ষা ছাড়া রেতিতে জলের ঢল নামে না। শুধু এপাশের জঙ্গলের গা ধরে একটা ছোট্ট স্রোত বয়ে যাচ্ছে। এই স্রোতটাই প্রমাণ করছে, নদী এখনও জীবিত। কিন্তু ওখানে মোটেই বেশি জল নেই। জলের নীচের পাথরগুলো পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

সায়নের খুব ইচ্ছে করছিল, আর-একটু নেমে নদীর ধারে পৌঁছে জলে হাত দেয়। অমন শান্ত স্বরে যে নদী ডেকে যায়, তার শরীর কত না শীতল হবে! সায়ন যে-ই পা বাড়াতে যাবে, ঠিক তখনই চমকে উঠল। মানুষের গলার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। কেউ আচমকা কিছু বলে উঠল। সঙ্গে-সঙ্গে সে সতর্ক হয়ে যেন গাছের সঙ্গে মিশে গেল।

কথা বলছে একটা লোক, দুটো গলা তাকে সমর্থন জানাচ্ছে। কিন্তু সংলাপ হচ্ছে চাপা ভঙ্গিতে এবং তাতে সতর্কতার ছাপ আছে। সায়ন নড়ছিল না। মিনিট দুয়েক পরে সে তিনটে মানুষকে দেখতে পেল। ঠিক আমেরিকান কাউবয়দের মতো পোশাক। দুজনের কোমরে ভোজালি ঝুলছে। একজনের কোমরে রিভলভারের চেয়ে লম্বা একটা আগ্নেয়াস্ত্র। লোক তিনটে খুব লম্বা নয়, কিন্তু স্বাস্থ্য সুগঠিত। কাউবয়দের সঙ্গে এদের তফাত শুধু এক জায়গায়। এদের মাথায় টুপি নেই। পেছনে একটি পুষ্ট টিকি ছাড়া সমস্ত মাথাটা পরিষ্কার করে কামানো। মুখ চোখ দেখে পরিষ্কার বোঝা যায়,

এরা মঙ্গোলিয়ান ঘরানার মানুষ। এবং যে-ভাষায় এই তিনটে মানুষ কথা বলছে, তা সায়নের মোটেই বোধগম্য হল না। তিনটে মানুষই যেন অনেকক্ষণ ধরে কিছু খুঁজেছে, না পেয়ে এখন কিছুটা ক্লান্ত। তারপর ওরা তিনজন লাফিয়ে-লাফিয়ে রেতি নদীর দিকে নেমে গেল। এবং তখনই সায়নের চোখে পড়ল, নদীর বুকে একটা বিশাল বোল্ডারের গায়ে তিনটে ঘোড়া চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। ঘোড়া তিনটেই খাটো এবং ছোট সাইজের। মানুষগুলোর সঙ্গে চমৎকার মানানসই। সায়নের চোখের সামনে তিনটে ঘোড়া এবার সওয়ার পিঠে নিয়ে ছুটে গেল নদীর শুকনো বুক ধরে। তারপর ওপাশের জঙ্গলের ভেতর আচমকাই মিলিয়ে গেল।

সায়ন মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছিল না। এই তিনটে লোক কে? তাদের এই অঞ্চলের কোনও মানুষ ওই রকম পোশাক পরে না, ওই ভাষায় কথাও বলে না। তা ছাড়া সে জানত, একমাত্র তার বাবা ছাড়া আর কেউ ঘোড়া পোষেন না এখানে। কিন্তু খানিক আগে যাকে দেখেছে, তাকে ধরলে আজ চার-চারটে ঘোড়া সে দেখতে পেল। বুধুয়া-বুড়ো সঙ্গে থাকলে নিশ্চয়ই লোকগুলোকে শয়তান, এবং ওই তিনটেকে শয়তানের ঘোড়া, বলার চেষ্টা করত। কিন্তু সায়নের মনে হল, ব্যাপারটা এক্ষুনি বাবাকে জানানো দরকার। চেহারা পোশাক এবং ভাষার মধ্যে সামান্য মিল নেই, এমন কিছু রুক্ষ মানুষ ওই পাহাড় থেকে নেমে আসছে, মতলব নিশ্চয়ই কিছু আছে। তাদের স্কুলে কিছুদিন আগে কাউবয়দের নিয়ে একটা ছবি দেখিয়েছিল। কী নির্দয় হয় মানুষগুলো। হাতে দড়ির ল্যাসো নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে তেড়ে যায় শিকার-সন্ধানে। সামান্য বাধা পেলে দু'হাতে দুড়ুম দুড়ুম বন্দুক চালায়। তাদের কপালের একভাগ টুপির বারান্দায় ঢাকা থাকে। শেষটা ছাড়া এই লোক তিনটে হুবহু সেইরকম। ভারতবর্ষের মানুষের সঙ্গে কোনও মিল নেই।

সায়ন নদীর ওপারের জঙ্গলটার দিকে তাকাল। শেষ-দুপুরের রোদে মাখামাখি ভুটানের পাহাড়টাকে খুব শান্ত দেখাচ্ছে। তিনটে লোক ঘোড়া ছুটিয়ে ওখানে ঢুকে গেল, অথচ কোনও ধুলোর ঝড় উঠছে না। চা-বাগানের মধ্যে হলে তো এতক্ষণে আকাশ অন্ধকার হয়ে যেত। আর তখনই সায়নের মনে হল, ওরা যদি তিনজনের চেয়ে অনেক বেশি সংখ্যায় এসে থাকে, এবং বাকিরা এখন এদিকেই রয়ে যায়, তা হলে তো সে ধরা পড়ে যাবে। আর লোকগুলোর মুখচোখ এবং হাঁটাচলা দেখে ডাকাত ছাড়া অন্যকিছু মাথায় আসছেও না। সায়ন যেখানে ছিল, সেখানেই আরও আধঘণ্টা স্ট্যাচুর মতো দাঁড়িয়ে রইল। এবং এই সময়ের মধ্যে সে পাখির ডাক এবং গাছগাছালির নিজস্ব শব্দ ছাড়া অন্যকিছু শুনতে পায়নি। শেষপর্যন্ত, তার মনে হতে লাগল, আর কেউ নেই এই তল্লাটে।

সন্তর্পণে সে জঙ্গল সামলে হাঁটতে লাগল চা-বাগানের দিকে। তার বুক ঢিপঢিপ করছিল। বুধুয়া-বুড়োর কথা শুনে বাংলোয় থেকে গেলেই ভাল হত।

মাথার ওপর ছায়া-ছায়া গাছের ডাল। সামনে সোজা পথ নেই। সায়ন ছটফটে পায়ে এবার এগোচ্ছিল। যত তাড়াতাড়ি পারে, জঙ্গলটা ডিঙিয়ে চা-বাগানে পড়লেই এক-ছুটে বাংলোয় পৌঁছে যাবে সে।

হঠাৎ একটা বাঁক নিতেই খসখস শব্দ কানে এল। দাঁড়িয়ে পড়ল সায়ন। কেউ যেন হেঁটে আসছিল। তার পায়ের শব্দ পেয়ে থমকে গেছে। কী করবে বুঝতে পারছিল না সে। উল্টোদিকে ছুটে কোনও লাভ নেই। ওই পথ রেতি নদীতে নেমেছে। আর সামনের পথে যে দাঁড়িয়ে, সে নিশ্চয়ই তার অস্তিত্ব সন্দেহ করেছে।

হঠাৎ একটা শক্তি মনে টেনে আনল সায়ন। সে তো কারও অন্যায় করেনি। কোনও কুমতলবে এখানে আসেনি। কারও ক্ষতি করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে তার নেই। সে এসেছিল বেড়াতে। কোনও নতুন জিনিস দেখেনি। এখন বেরিয়ে চলে যাচ্ছে।

যতটা সম্ভব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে পা বাড়াল সায়ন। আর গাছের আড়াল সরে যেতেই সে হতভম্ব হয়ে গেল। মাত্র দশ গজ দূরে দাঁড়িয়ে তার দিকে অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে আছে সেই ঘোড়াটা।

সমস্ত শরীরে ধুলোমাখা, খাটো কিন্তু শক্তিশালী চেহারা। চোখ দুটো খুব মায়াবী। আর সেই চোখে তাকে দেখছে একদৃষ্টিতে। মাঝে-মাঝে লেজ নেড়ে হয়তো মাছি তাড়াচ্ছে পা থেকে। সায়ন দেখল আর পাঁচটা ঘোড়ার মতো এ জীবন্ত। শয়তানের ঘোড়া ভাবার কোনও কারণ নেই। তার খুব ইচ্ছে করল ঘোড়াটার পিঠে উঠতে। কারণ জিন কিংবা রেকাবি না থাকলেও একটা লাগাম রয়েছে ওর মুখে সাঁটা। সে এক পা এগোতে ঘোড়াটা নড়ল, কিন্তু সরল না। সায়ন ঘোড়াটার দিকে তাকিয়ে হাসবার চেষ্টা করল, যাতে ও তাকে ভাল ছেলে বলে মনে করে। ঘোড়াটার চোখে সন্দেহ, এবং সায়নের মনে হল, কিছুটা কৌতূহলও উঁকি দিচ্ছে। সে আর-একটু এগোতেই ঘোড়াটা মুখ ফিরিয়ে সামনের পা-দুটো উঁচু করেই নামিয়ে নিল। কিন্তু পালিয়ে গেল না।

মিনিট দশেক লাগল সায়নের ঘোড়াটার পাশে পৌঁছতে। ঘোড়াটা ততক্ষণে কান খাড়া করে দাঁড়িয়েছে মাথা তুলে সতর্ক ভঙ্গিতে। সায়ন ধীরে-ধীরে ওর পিঠে হাত বোলাতে লাগল। শরীরটা তিরতির করে কাঁপছে। সায়নের মনে হল, ওদের এতক্ষণে ভাব হয়ে গিয়েছে।

সে লাগামটা ধরল। ন্যাড়া পিঠে রেকাবি ছাড়া সে কোনওদিন ঘোড়ায় চাপেনি। মাঝে-মাঝে সুপ্রকাশ তাকে নীলাম্বরের পিঠে তুলে বাংলোর লনে পাক খাওয়াতেন। সেখানে বসার এবং পা রাখার জায়গা ছিল আরামের। কিন্তু এই ঘোড়াটা তো বেশ বেঁটে। পড়ে গেলে নিশ্চয়ই খুব লাগবে না। সায়ন লোভ সামলাতে পারল না। ঘোড়াটার পিঠে চেপে বাংলোয় ফিরে গেলে বুধুয়া-বুড়ো তো বটেই, বাবা-মা পর্যন্ত হতবাক হয়ে যাবেন। সে লাগাম ধরে শরীর ঘষটে ঘোড়াটার পিঠে উঠে বসতেই জন্তুটা সামনের পা দুটো শূন্যে তুলে লাফিয়ে উঠল প্রতিবাদে। কোনওরকমে লাগাম আঁকড়ে ধরে পতন সামলাল সায়ন। আর তারপরেই চোখের পলকে কাণ্ডটা ঘটে গেল।

বাংলো নয়, ঠিক উল্টোদিকে রেতি নদী ছাড়িয়ে ভুটানের পাহাড়ের দিকে ছুটতে লাগল ঘোড়াটা, তীরবেগে।

(ক্রমশ)

ছবি : অনুপ রায়

টারজান

এডগার রাইস বারোজ

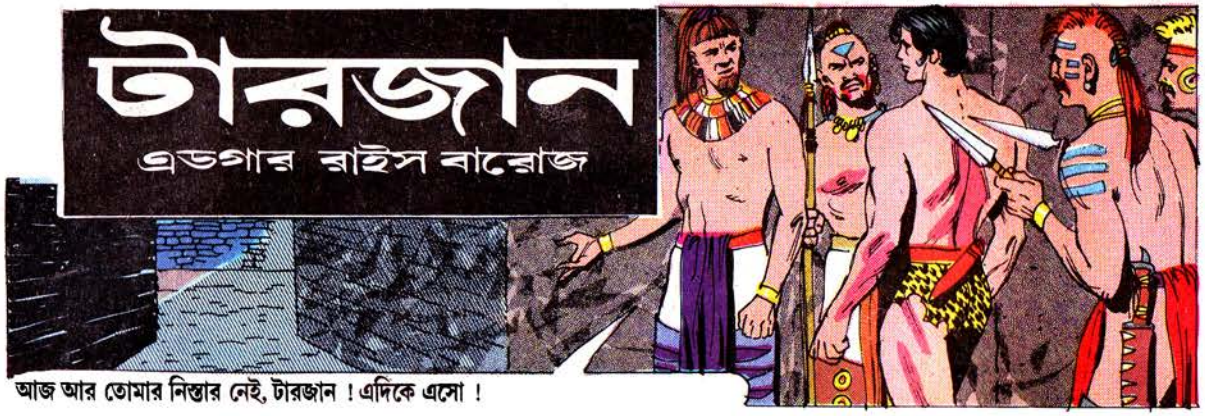

কাভুরুদের হাত থেকে পালিয়ে এসেছে বুইরা আর লা-গলিয়েন ।
মুভিরোকে তারা জানিয়েছে যে, টারজান এখন কাভুরুদের হাতে বন্দী ।

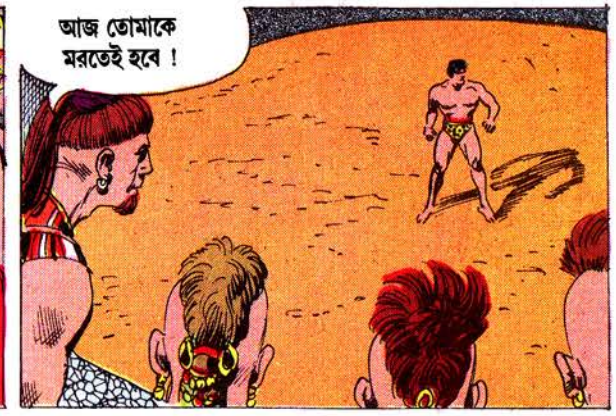

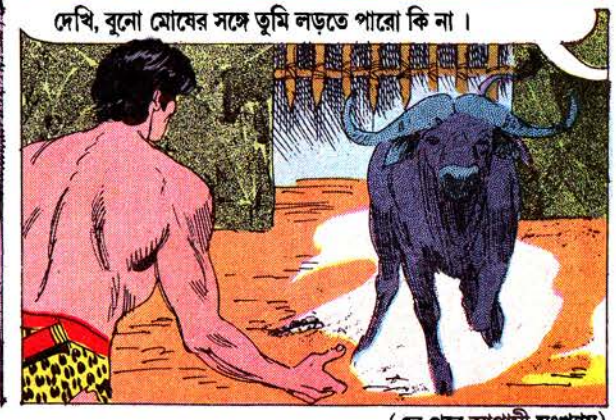

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

ধাঁধা

ছোট্কার স্মৃতিশক্তি যে ভাল, এটা সবাই জানে। রবীন্দ্রনাথের বিশাল-বিশাল কবিতা ছোট্কার কণ্ঠস্থ। গীতবিতানের গানের কথায় ভুল করলে সঙ্গে-সঙ্গে হাঁ-হাঁ করে উঠবে ছোট্কা। শেকসপিয়ারের নাটক থেকে অনর্গল মুখস্থ বলে যাওয়াও কিছু আশ্চর্যের নয় ছোট্কার পক্ষে এ আমরা সব সময় দেখছি। ছোট্কা আবৃত্তির অফিস থেকে ফিরে এসে গজগজ করছে, বেশিরভাগই নাকি পাঠ করেছে খাতা-বই দেখে। রেডিওতে কেউ গানে ভুল করল কোথাও, ছোট্কা রেগে-মেগে বন্ধই করে দিল রেডিও। সেজদাদুর সঙ্গে শেকসপিয়ার নিয়ে তর্ক হচ্ছে, ছোট্কা গড়গড় করে আওড়াচ্ছে শেকসপিয়ার এত মনে রাখে কী করে কে জানে।

সেদিন ছোট্কার মনে-রাখার একটা সূত্র খুঁজে পেলাম। কিন্তু সূত্রটা শুনতে যত সোজা, সূত্র ধরে এগোনো মোটেই তেমন সহজ নয়। এও এক ধরনের ধাঁধাই বলা যায়, যে জানে, সে-ই শুধু জানে এর উত্তর। ব্যাপারটা তাহলে খুলেই বলি।

ছোট্কার অফিসের ফোন নাম্বার নাকি বদলে গেছে। সেজদাদু জানতে চাইল নম্বরটা কী। ছোট্কা তার উত্তরে বলল, "একসচেঞ্জ তো আগের মতোই। এবার পরেরটুকু বলছি। জানা কথা, চার অঙ্কের একটা সংখ্যা। প্রথম অঙ্কটা শেষ অঙ্কের অর্ধেক। দ্বিতীয় অঙ্কটা তৃতীয়ের থেকে তিন কম, তৃতীয় অঙ্কটাকে দ্বিগুণ করলে যা হয় তা হল প্রথম ও শেষ অঙ্কের যোগফল। তবে হ্যাঁ, এর মধ্যে কোথাও শূন্য-টুন্য নেই।"

সেজদাদুও কম চালাক নয়। সব শুনে বলল, "এ তো খুবই সোজা ব্যাপার। একবার শুনলেই মনে গেঁথে যায়। ঠিক আছে, কালই আমি ফোন করব নতুন নম্বরে।"

সত্যি কি তাই ? আমার তো মাথায় ঢুকছে না কী সেই চার অঙ্কের সংখ্যা, যাতে এত কাণ্ড ? তোমরা বলতে পারো ? এটাই তাহলে হোক এবারের প্রথম ধাঁধা।

দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ INDOLENT শব্দটার একটা সহজ প্রতিশব্দ নাকি মূলের মধ্যেই লুকনো রয়েছে। সেটাকে টেনে বার করতে পারো ?

তৃতীয় ধাঁধা ॥ জট ছাড়াও—বলাডারণ

গতবারের উত্তর ॥ (১) আইসক্রিমের অর্ডার দিয়েছিল শান্তনু। (২) যখন ১১ হয়। (৩) চটজলদি।

সত্যসন্ধ

শব্দ-সন্ধান

১			২	■	৩	৪
	■	■		■	৫	
	■	৬		৭	■	■
৮			■	৯		১০
■	■	১১	১২		■	
১৩	১৪	■		■	■	
১৫		■	১৬			

সংকেত : পাশাপাশি : (১) প্রাচীর। (৩) প্রতিমা বা পুতুল গড়তে লাগে। (৫) কণ্ঠাভরণ। (৬) রাত্রিবেলায় জ্বলে-নেভে। (৮) শসা। (৯) পদ্ম। (১১) রুপো। (১৩) ভারতের সবচেয়ে প্রাচীন শাস্ত্র ও সাহিত্য। (১৫) শরীর। (১৬) মশালবাহক।

উপর-নীচ : (১) রাজা-মন্ত্রীদের সঙ্গে সঙ্গে থাকে। (২) একটি মঙ্গলকাব্যের এক নারীচরিত্র। (৩) সূর্য-চাঁদকে ছেলেবেলায় কী নামে ডাকো ? (৪) ছোট পাহাড়। (৬) সার্কাসের বিশেষ আকর্ষণ। (৭) ব্যাধ। (১০) বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের মধ্যে একজন। (১২) চোট বা আঘাত। (১৩) যাযাবর জাতিবিশেষ। (১৪) 'হ্রদ' থেকে বর্ণবিপর্যয়ে কোন্ শব্দ ?

রঞ্জন

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যার সমাধান

জা	ম	■	■	■	চ	ক
ম	ন্দি	রা	■	চ	ন্দ	ন
দ	র	■	খ	■	না	খ
গ্ন্য	■	ম	ঞ্জ	রি	■	ল
■	ক	■	ন	■	ম	■
ক	ণ্ট	কী	■	ম	স্থ	রা
পি	ক	■	■	■	র	স

মজার খেলা

এবারের মজার খেলার জন্য ১১টা দেশলাইকাঠি বা টুথপিক যোগাড় করতে হবে। যোগাড় হলে, কাঠিগুলোকে টেবিলের উপর সাজাতে হবে নীচের ছবির মতো, একটা ভুল অঙ্ক দেখিয়ে—

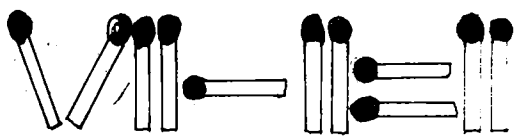

অঙ্কটায় এখন আছে ৭-২=২। পরিষ্কার ভুল। এবার কী করতে হবে শোনো। দুটো মাত্র কাঠিকে তুলে নতুনভাবে বসিয়ে অঙ্কটাকে একটা নির্ভুল চেহারা দিতে হবে।

ব্যস। তাহলে লেগে পড়ো। তবে হ্যাঁ, একটা কথা বলে রাখি। এর উত্তর কিন্তু দু-রকম হয়। অর্থাৎ দু-ভাবে সাজানো যায় নির্ভুল অঙ্কের চেহারায়। সেটা মনে রেখে উত্তর করে।

কী, এক রকমই হচ্ছে না? বেশ, তাহলে দুটো উত্তরই পর পর দেখাই। না পারলে নাহয় দেখেই নিয়ো।

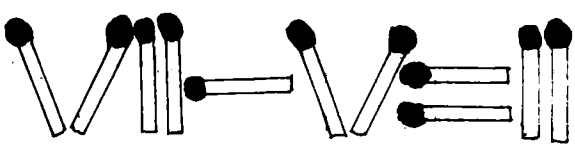

কিংবা

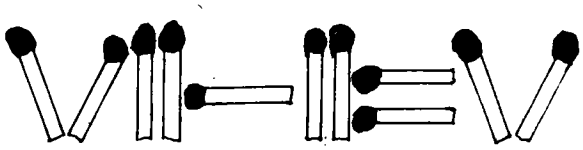

এবার কী মনে হচ্ছে? খুব সোজা। তাই না?

মজারু

হাসিখুশি

"কলার খোসা কি খুব নোংরা জিনিস বাবা?"

"না তো।"

"তা হলে রাস্তায় কলার খোসা ফেললে বকুনি দাও কেন?"

"আপনার দোকানের চালে দেখছি কাঁকরের ছড়াছড়ি। অথচ বিজ্ঞপ্তিটি তো বেশ ঝুলিয়ে রেখেছেন—'সততাই আমাদের একমাত্র মূলধন'।"

"তাতে ভুলটা কোথায় দেখলেন? আপনাদের মতো সৎ লোক আছে বলেই তো এদিকটায় কেউ নজর দেয় না।"

পিকলুর জ্যাঠামশাইকে পাগলা কুকুর কামড়াবার পর ডাক্তার যখন বুঝলেন সারবার আশা নেই, তখন বললেন, "আপনার শেষ ইচ্ছা কাউকে দিয়ে লিখিয়ে দিন, আমি অপেক্ষা করছি।"

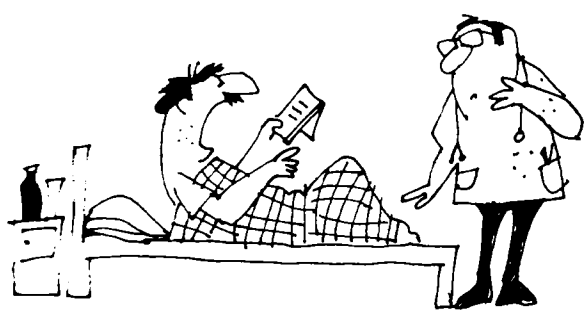

পাক্কা পাঁচ ঘণ্টা পরে অধৈর্য হয়ে ডাক্তারবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার উইল এখনও তৈরি হল না?"

রেগেমেগে উত্তর দিলেন জ্যাঠামশাই, "উইল নয়, পাগল হবার পর কাকে কাকে কামড়াব তার লিস্ট তৈরি করছি।"

"আমার বড়মামা কাল আমাদের বাড়িতে এসেছেন। জানিস তো উনি পুলিশের বড়কর্তা?"

"পরশুদিন তোর শেফার্স কলমটা ভুলে নিয়ে চলে গিয়েছিলাম। আজই দিয়ে যাব।"

অপারেশনের আগে এক সীবন-শিক্ষয়িত্রী রোগিণী সার্জেনকে জিজ্ঞেস করলেন, "কী সেলাই দেবেন ডাক্তারবাবু, হেম না বকেয়া?"

কারামন্ত্রী দীর্ঘ-মেয়াদি আসামিদের সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বললেন। প্রায় সবাই বলল, তারা নির্দোষ। একজন আসামিই শুধু বলল, "হুজুর, আমি সত্যিই দোষী। সেজন্যই আমি জেলে পচছি।"

কারামন্ত্রী জেলারকে বললেন, "এই দোষী লোকটাকে এক্ষুনি জেল থেকে বের করে দিন। ওর সঙ্গে থাকলে এতগুলো নির্দোষ লোক একেবারে খারাপ হয়ে যাবে।"

ছবি : দেবাশিস দেব

LINTAS LR.42-2739 BG

নতুন লিরিল
তরতাজা করা এক নতুন অনুভব!

লিরিল অনন্য নতুন রূপে !
মন কেড়ে নেওয়া
এক অপরূপ নতুন সুরভিতে...
আকর্ষণীয় নতুন প্যাকে।

নতুন
লিরিল
তরতাজা হবার সাবান

আপনাকে পরিণত করে লাবণ্যে
ঢলঢল নারীতে!

হিন্দুস্তান লিভার-এর উৎকৃষ্ট উৎপাদন।

গাছের গল্পগাছা

অম্বুজেন্দ্র ঘোষ

গালগল্প নয়, গাছের গল্প। আমাদের ইতিহাসে এইসব গল্প চিরকালের জন্যে রয়ে গেছে।

নৃপতি বিম্বিসারের সময়ে তক্ষশিলাতে খুব নামকরা একটি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। সেখানে নানান বিষয়ের সঙ্গে আয়ুর্বেদশাস্ত্রও পড়ানো হত। পড়াতেন বিখ্যাত আচার্য আত্রেয়। নানা দেশ থেকে ছাত্ররা তাঁর কাছে পড়তে আসতেন। জীবক কৌমারভৃত্যও তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়ুর্বেদশাস্ত্র পড়তে এসে ভাগ্যক্রমে আচার্য আত্রেয়র ছাত্র হয়ে যান। পরে তিনি বুদ্ধদেবের চিকিৎসক হয়েছিলেন।

গুরু আত্রেয় যেমন সুন্দর করে পড়াতেন, তেমনি ছাত্রদের পরীক্ষাও নিতেন একেবারে নতুন পদ্ধতিতে।

জীবক যেবার পরীক্ষা দিচ্ছিলেন সেবারও আচার্য পরীক্ষা নিলেন এক অভিনব উপায়ে। তিনি ছাত্রদের ডেকে বললেন, 'তোমরা তক্ষশিলার সমস্ত গাছগাছালি তন্নতন্ন করে পরীক্ষা করে এমন কোনও উদ্ভিদ আমার কাছে এনে হাজির করো যার একটুও ভেষজগুণ নেই।' বলা বাহুল্য, এজন্য গুরু তাঁর ছাত্রদের সাত দিন সময়ও দিয়েছিলেন।

সাত দিন পরে সবাই কোনও-না-কোনও উদ্ভিদ নিয়ে হাজির হলেন গুরুর সামনে. শুধু জীবক ফিরে এলেন খালি হাতে। তিনি গুরুকে জানালেন যে. এমন কোনও উদ্ভিদের সন্ধান তিনি পাননি যার ঔষধিমূল্য নেই। জীবকের এই অকাট্য উত্তরের জন্য গুরু আত্রেয় তাঁকে প্রাণভরে আশীর্বাদ করেছিলেন। সেবার আয়ুর্বেদ পরীক্ষাতেও জীবক সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন।

আসলে আমাদের চারধারে গজিয়ে ওঠা গাছপালারা কোনও দিক দিয়েই হেলাফেলার বস্তু নয়। আদ্যিকালে আমাদের দেশে আরও অনেক বেশি গাছপালা ছিল। তা সত্ত্বেও তখনকার মানুষ সুযোগ পেলেই গাছ পুঁতেছেন, গাছের সংখ্যা বাড়িয়েছেন।

পৃথিবীতে গাছ আগে এসেছে, পরে আমরা। সংসারে যেমন বড়রা ছোটদের অনেক দায়দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নেন তেমনি পৃথিবীতে আগে এসেছে বলে গাছেরাও আমাদের প্রতি তাদের দায়িত্ব আর কর্তব্যের কথা কোনওদিনই ভোলেনি।

কতকাল ধরে ওরা আমাদের পায়ের তলার মাটিকে শক্ত করে ধরে রেখেছে এখানে-ওখানে শিকড়-বাকড় ছড়িয়ে দিয়ে। নদীর ভাঙন থেকে, বন্যা থেকে আমাদের বাঁচাচ্ছে। দুর্ভিক্ষের দিনে নিরন্নের মুখে তুলে দিচ্ছে নানারকমের ফল, কাটফাটা রোদে কিংবা বৃষ্টিবাদলে মাথার উপরে ছাউনি সাজিয়ে দিয়ে কখনও দিচ্ছে ছায়া, কখনও হয়ে যাচ্ছে ছাতা।

আর ওষুধ তৈরির কাজে এরা যেন দধীচি।

আমাদেরই জন্যে এরা বাতাসে বিলিয়ে দিচ্ছে জীবনদায়ী অক্সিজেন, শুষে নিচ্ছে প্রাণঘাতী কার্বনডাই অক্সাইড। ধুলোয় ধাঁধানো বাতাসের বিষ ছিনিয়ে নিয়ে মানুষের পরিবেশকে নির্মল করে তুলছে। যেখানেই গাছ বেশি সেখানেই বৃষ্টি বেশি। মেঘকে আকর্ষণ করার আশ্চর্য ক্ষমতা এদের।

এবার গাছের কিছু গল্প শোনা যাক।

আফ্রিকায় 'চিনার' নামে এক জাতীয় গাছ আছে, যার পাতায়-পাতায় ঘষা লাগলেই আগুন জ্বলে এবং সে আগুন মাঝে-মধ্যে বেশ ভয়ঙ্করও হয়ে ওঠে। আগুন জ্বলার ঘটনা অবশ্য রাত্রেই ঘটে। আফ্রিকার কোনও-কোনও রাগী কবি বা সাহিত্যিক তাঁদের সমাধিস্তম্ভের উপরে এই গাছ লাগিয়ে দেবার জন্যে মৃত্যুর আগেই তাঁদের স্বজনবন্ধুদের অনুরোধ করে গেছেন।

আরও ভয়ঙ্কর একজাতীয় গাছের খবর পাওয়া যায় সাউথ ওয়েল্‌স্ থেকে। এই গাছের নাম—Touch-me-not অর্থাৎ, 'আমাকে ছুঁয়ো না।' নাম শুনেই বোঝা যায় যে ওদের ছুঁলেই আঠারো ঘা।

'টাচ-মি-নট' গাছ প্রায় একশো ফুট লম্বা। একফুট লম্বা পাতার গায়ে ঘামাচির মতো খুদে-খুদে কাঁটা ছড়ানো। কাঁটার ডগায় সর্বনেশে বিষ! মানুষ, গোরু-ছাগল যেই হোক না কেন, এই কাঁটা ছুঁলেই সাংঘাতিক চর্মরোগে আক্রান্ত হবে।

আর্জেন্টিনার ছোলোপঁ গাছকে কেউ কাটতে এলে ওরা তক্ষুনি একরকম মিষ্টি শব্দ করে আর সেই 'বাজনা' শুনে কাটুনির শরীরের সব রক্ত শুকিয়ে যায়। এখানকার মানুষ এই গাছকে পুজো করে। অস্ট্রেলিয়ায় একরকমের গাছ আছে যার ব্যবহার আরও অদ্ভুত, কেউ বিরক্ত বা ক্ষতি করতে গেলে এই গাছ তার ডালপালা দিয়ে হঠাৎ তাকে অক্টোপাসের মতো জড়িয়ে ধরে চেপে মেরেই ফেলে। অবশ্য কেউ বিরক্ত না করলে এরা মিষ্টি সুরে গান শোনায়। সেই গান শুনে পশুপাখি, এমনকী মানুষ পর্যন্ত মোহিত হয়।

কলকাতার মানুষের মনে 'পার্থেনিয়াম-আতঙ্ক' শুরু হয়েছে বেশ কিছুদিন হল। পার্থেনিয়াম নামে যে-গাছের সন্ধান পাওয়া গেছে শহরের আনাচে-কানাচে তার সংস্পর্শে এলে চর্মরোগ, হাঁপানি ইত্যাদি অসুখের সৃষ্টি হবে বলে উদ্ভিদ-বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন। অবশ্য এই গাছের বদস্বভাবের মোকাবিলা করার জন্য আর-একরকমের গাছের সন্ধানও দিয়েছেন কেউ-কেউ।

তবে সব গাছ তো আর চিনার, ছোলোপঁ বা পার্থেনিয়াম নয়। সব গাছ বলে না, আমাকে ছুঁয়ো না, বেশির ভাগ গাছই আমাদের পরম উপকারী বন্ধু। তাই গাছের গায়ে দা-কুড়ুল পড়লে কিংবা ওদের অনাদর অবহেলা করলে আমাদের মধ্যে অনেকেই উদ্বেগ প্রকাশ করেন। শুনলে অবাক হবে যে, দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডারের সৈন্য-সামন্তদের সঙ্গে পাঠিয়ে দেওয়া হত একদল বৃক্ষবিশারদকে। যখন যে দেশ জয় হত অমনি সে-দেশে আরও গাছগাছালি লাগাবার জন্যে উঠেপড়ে লাগতেন তাঁরা।

গাছেদের সংসারেও মানব-সংসারের মতো শিশুমৃত্যুর অন্ত নেই। কোনও গাছ খুব অল্প বয়সেই মারা যায়, আবার কোনও

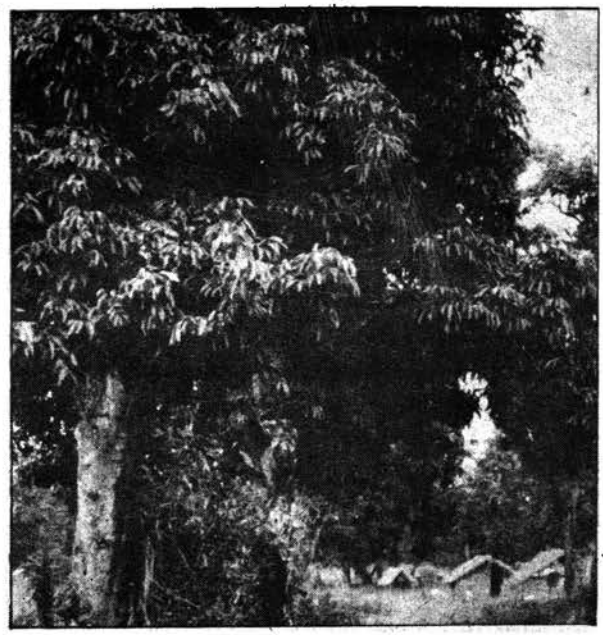

কোনও গাছের বয়সের গাছপাথর নেই। যেমন ধরো, নিরঞ্জনা নদীতীরে বুদ্ধদেব যে বোধিবৃক্ষটির তলায় বসে সুজাতার কাছ থেকে পায়েস খেয়েছিলেন, আবার 'বুদ্ধত্ব' লাভও করেছিলেন, সে-গাছ আজও আছে। নদীয়া জেলার বামুনপুকুরে চাঁদকাজির সমাধির উপরে সাড়ে-চারশো বছরের একটি চাঁপাগাছ আজও দাঁড়িয়ে আছে। শোনা যায়, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য এই গাছটি নিজের হাতে পুঁতে দিয়েছিলেন। মুর্শিদাবাদে মিরজাফরের বাড়ির পিছনে যে-বটগাছের তলায় বাংলার শেষ স্বাধীন নবাবকে মেরে ফেলা হয়েছিল, হতভাগ্য সেই গাছ সেই করুণ ঘটনার সাক্ষী হয়ে আজও দাঁড়িয়ে আছে। মুজফরপুরের বিশ মাইল পুবে গঙ্গার ধার ঘেঁসে এখনও দাঁড়িয়ে আছে পাঁচ হাজার বছরের সেই 'শখের তাল' নামক ইতিহাসবিশ্রুত গাছটি। শখের তালগাছে কস্মিনকালেও তাল হয় না। কেননা ওটি বটগাছ। নামটিই শুধু 'তাল'গোল পাকানো।

এবার একটা অদ্ভুত খবরের দিকে মন দেওয়া যাক। প্রতি বছর ইস্রায়েলের মানুষ মার্চ মাসের মাঝামাঝি সময়ের একটি নির্দিষ্ট দিনকে গাছেদের 'নববর্ষের দিন' বলে সরকারিভাবে ঘোষণা করেন। ওদেশের গাছেরা হয়তো ওদের নববর্ষের দিনটার খবর রাখে। উপভোগও করতে পারে ওই দিনটার আনন্দ। আসলে এ-রকম ভাবতে ভাল লাগে।

আমাদের এই শহর কলকাতায় বেলেঘাটার একটা ছোট্ট মেয়ে কাঁচা হাতে এঁকেছিল সার দিয়ে দাঁড়ানো পাঁচটা গাছ। মধ্যিখানের গাছটা একটু বড়সড় ছিল, বাকিরা ছোট। ছবিটা দেখামাত্র আমাদের পরিচিত একজন বিখ্যাত কবি লিখে দিলেন, 'মধ্যিখানের গাছটা যেন মা'। গাছকে ভালবাসতে পারলেই তবে তাদের সেই সংসার চোখে পড়ে, যে-সংসারে মা-বাবা ভাইবোন সব আছে। তখন আর ওদের গায়ে কঠিন হাত পড়ে না।

উদাসীন মানুষের অবহেলায় আমাদের গর্বের শহর কলকাতার অসংখ্য গাছের চেহারা কেমন যেন শুকিয়ে যাচ্ছে। মনে হয় মাঝরাতে ওদের কারও-কারও 'ঘুসঘুসে জ্বর হয়'। এটা কোনওমতেই হতে দেওয়া উচিত নয়।

চট্‌জল্‌দি

মৃণাল বসুচৌধুরী

চট্‌জল্‌দি জবাব দে,
পতৌদির নবাব কে ?
টাকির পাশে নদীর নাম ?
কখন ফলে গোলাপজাম ?
পারলি না তো, পারলি না,
কী বলছিস ? হারলি না ?
আচ্ছা তবে, বল তো বেশ
ক্রিকেট খেলে কয়টি দেশ ?
মুনির নামে কোন্ ক্রিকেটার—
যখন তখন হাঁকায় চার ?
পারলি না তো, পারলি না,
তবু বলছিস হারলি না ?

ইচ্ছে

প্রদীপকুমার মিত্র

আকাশটা যদি হত
সাদা পরদা,
যদি রং-তুলি কিনে
দিত বড়দা
আঁকতাম তিরতিরে
নদীটির ছবি,
বাহবা দিতেন দেখে
শিল্পী ও কবি।

ভৌতিক

প্রমোদ বসু

ভূতের স্বর নাকি—
সত্যি বলছ না কি ?
গর্ত-করা নাক-ই-
স্থানের বাজনা কি ?

ভূতের গলা সাধা—
জলের মতন সাদা,
সা রে গা মা সা ধা
কী অপূর্ব স্বাদ—আ !

ভূতেরা গান বোঝে।
গানের শ্রোতা খোঁজে।
নানান রকম ভোজে
গান গেয়ে চোখ বোজে।

ছবি : অনুপ রায়

(সম্পূর্ণ উপন্যাসের শেষাংশ)

জুবিলি সার্কাসের আজব খেলা

অজেয় রায়

দু'দিন পরে দুপুরবেলা সুনন্দ বলল, "জানেন মামাবাবু,আজ বাপি রায়কে দেখলাম সার্কাসে।"

"কে বাপি রায় ?" মামাবাবু জানতে চাইলেন।

"সেই যে মেডিকেল কলেজের প্রফেসর, বিখ্যাত নিউরো সার্জন ডক্টর সেনের কাছে রিসার্চ করত। একদিন ডঃ সেনের সঙ্গে এসেছিল আমাদের বাড়িতে। খুব আমুদে।"

"হুঁ মনে পড়ছে," বললেন মামাবাবু, "ডঃ সেন বলেছিলেন, ছেলেটা ব্রিলিয়ান্ট তবে বড্ড খামখেয়ালি। খুব ভাল কাজ করছিল। কিন্তু হঠাৎ রিসার্চ ছেড়ে চলে গেছে। ডঃ সেন আমায় বলেছিলেন যে বাপি নাকি জানিয়েছে যে ও মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভের চাকরি নিয়েছে। ঘুরে ঘুরে বেড়াতে হয়। বাড়িতে টাকার প্রয়োজন তাই চাকরিটা নিতে হয়েছে। কিছুদিন পরে গিয়ে ফের রিসার্চে ঢুকবে। ডঃ সেন রাগ করেছিলেন, ওঁকে কেন বলল না চাকরি দরকার। তাহলে কলকাতাতেই কিছু একটা জুটিয়ে দিতে পারতেন। চাকরি ও রিসার্চ দুটোই চালাতে পারত। ছেলেটাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন ডঃ সেন। কিন্তু ও এড়িয়ে গেছে, আসেনি। তা ও এখানে কী করছে ?"

সুনন্দ জানাল, "বাপি বলল, ও এই সার্কাসে চাকরি নিয়েছে। অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার। ওর নাকি সার্কাসের লাইফ খুব ভাল লাগে। খেলাও শিখছে। আরে, প্রথমে তো আমায় যেন চিনতেই পারে না। সকালে বাজারে গিয়েছিলাম। ভাবলাম সার্কাসটা এক চক্কর দেখে যাই। সার্কাসের বাইরে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ দেখলাম ওকে। বাপি, বলে ডাকলাম। ও আমার দিকে একবার তাকিয়েই হনহন করে ভিতরে ঢুকে গেল। আমিও ছাড়বার পাত্র নই। লুকিয়ে নজর রাখলাম। ঘণ্টাখানেক বাদে মূর্তিমান গেটের বাইরে এল। এদিক-সেদিক দেখে গুটিগুটি গিয়ে দাঁড়াল কাছেই একটা সিগারেটের দোকানে। ব্যস্, আমিও গিয়ে খপ্ করে ওর হাত চেপে ধরে বললাম, আরে বাপি যে ! আর যায় কোথা ? তখন বলে কি না, হ্যাঁ, কে যেন ডাকল মনে হল। আমায় নাকি ও চিনতেই পারেনি। স্রেফ গুল। ইচ্ছে করে কেটে পড়েছিল।"

মামাবাবু কিঞ্চিৎ ভেবে বললেন, "আজ আমি আবার সার্কাস দেখতে যাব ভাবছি। তোমরা কেউ যাবে নাকি ?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, যাব বইকী।" আমরা দুজন তৎক্ষণাৎ রাজি।

সেদিনও গেলাম পাঁচটার শোয়ে। মামাবাবুর নির্দেশমতো বসলাম চেয়ারে নয়, কাঠের তক্তা পাতা উঁচু গ্যালারিতে। জন্তু-জানোয়ারের খেলা শুরু হতেই দেখি মামাবাবু কাঁধের ঝোলা থেকে একটা দূরবিন বের করে চোখে লাগালেন।

বাঁদরের খেলা হল। কুকুরের খেলার শেষে মামাবাবু বললেন, "সুনন্দ, বায়নাকুলারটা দিয়ে দ্যাখ তো, পর্দার ধারে যে নিচু টুলে বসে, বাপি রায় কি না ?"

সুনন্দ দূরবিন দিয়ে খানিক দেখে বলল, "হ্যাঁ, তাই মনে হচ্ছে। তবে টুপি আর গোঁফ লাগিয়েছে। ওটা ফল্‌স গোঁফ, সকালে দেখিনি।"

সেদিনও প্রত্যেক জন্তুর সাধারণ খেলার শেষে ছিল তাদের মানুষের ভাষা বোঝার চমক! তবে খেলাগুলো কিছু পালটানো হল। সেদিন মিলিটারি বাঁদর মানিকচাঁদকে দর্শকরা 'কুইক মার্চ' অর্ডার দিতেই খুঁটিকে পাক খেয়ে ঘুরতে শুরু করল। এবং হল্ট বলতেই থামল।

দর্শকরা মানিকচাঁদকে ভিতু বা কাওয়ার্ড বলতেই সে বেজায় খেপে গেল। 'দুঃখিত', 'মাপ কিজিয়ে' এবং 'সরি' বলতে তবে শান্ত হল।

কুকুর পঞ্চুকে সেদিন চোর অপবাদ দিয়ে চটানো হল না। ট্রেনারের কথামতো সেদিন পঞ্চুকে এক দর্শক বিস্কুট খাওয়াবার প্রতিশ্রুতি দিতে সে মহা ফুর্তিতে ল্যাজ নেড়ে দু'পা তুলে ঘুরে-ঘুরে নাচ দেখাল। এবং মাস্টার পটল সেই দর্শকের কাছ থেকে বিস্কুটের দাম বাবদ পঞ্চাশ পয়সা তক্ষুনি আদায় করে ছাড়ল। দর্শকদের অনুরোধ বা আদেশমাফিক ভাল্লুক জাম্ববান যথারীতি এক্‌সারসাইজ দেখাল এবং হুকুম করতেই থামল। সিংহমহারাজও দর্শকদের কথায় মাটিতে শুয়ে নাক ডাকাতে শুরু করেছিল, কিন্তু বেশিক্ষণ আয়েস করা বেচারার ভাগ্যে নেই। কারণ একটু বাদেই তাকে উঠতে বলায় বাধ্য হয়ে গা তুলল। বোধহয় ভাল্লুক ও সিংহ এর বেশি মানুষের ভাষা বোঝে না।

ফেরার পথে মামাবাবুর মুখ থমথমে। কথা নেই। শুধু একবার বললেন, "বাপি রায়কে একবার আমার কাছে আনতে পারবে ? নইলে অবশ্য আমিই যাব ওর কাছে।"

পরদিন সকালেই বাপি রায়কে নিয়ে সুনন্দ হাজির। সহজে তাকে পাকড়াতে পারেনি। কিঞ্চিৎ কৌশল করতে হয়েছিল। অনেকক্ষণ সার্কাসের ঘেরার বাইরে চক্কর মেরেও বাপির দেখা না পেয়ে সে সার্কাসের অন্য একজনকে ধরে। বলে, "আমি ভেটারিনারি হসপিটাল থেকে আসছি। আমাদের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার মিস্টার রায়ের সঙ্গে আপয়েন্টমেন্ট আছে।"

অনেক জন্তু-জানোয়ার নিয়ে কারবার, তাই সার্কাসওয়ালাদের কাছে ভেটারিনারি হসপিটাল বা পশু হাসপাতালের লোকদের খুব খাতির। ফলে জুবিলি সার্কাসের লোকটি তক্ষুনি সুনন্দকে নিয়ে সোজা হাজির করে বাপির তাঁবুতে। এর পর প্রফেসর ঘোষ ডেকেছেন শুনে বাপি সুড়সুড় করে চলে এসেছে।

বাপির চেহারাটা ছোটখাটো। সুশ্রী মুখ। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। বেশ স্মার্ট। তবে যেন কিঞ্চিৎ নার্ভাস। আমারই বয়সী। বাপির সঙ্গে সুনন্দ আমার আলাপ করিয়ে দিল।

মামাবাবু বললেন, "বোসো বাপি।" আমরা সবাই বসলাম বৈঠকখানায়।

মামাবাবু গম্ভীর গলায় বাপিকে জিজ্ঞেস করলেন. "এই সার্কাসে কী করছ ?"

"আজ্ঞে চাকরি," উত্তর দিল বাপি।

"তুমি না মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভের চাকরি নিয়েছিলে ? ডঃ সেন বলেছিলেন আমায়।"

বাপি মাথা চুলকোয়। মুখে কথা নেই।

"জন্তুগুলোর মাথায় ইলেকট্রোড বসিয়েছে কে ? তুমি ?" ঠাণ্ডা গলায় কাটা-কাটা ভাবে মামাবাবুর মুখে এই অদ্ভুত কথাক'টি শুনে আমরা চমকে উঠলাম। বাপির চোখ বড়-বড়, ঢোঁক গিলছে।

মামাবাবু আবার বললেন, "তুমি বুঝি ওদের ব্রেন স্টিমিউলেট করছ রিমোট কন্ট্রোলে ? আর ভাষা বোঝার খেলা দেখাচ্ছ ?"

বাপি হতাশভাবে বলে উঠল, "হুঁ কট্। কাল আপনাকে বায়নাকুলার হাতে দেখেই ভয় হয়েছিল, হয়তো ধরা পড়ে যাব।"

"হঠাৎ এই মতলব হল কেন ?" মামাবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

"আজ্ঞে সে অনেক ব্যাপার।" বাপি করুণ মুখে উত্তর দিল।

"শুনি কী রকম ?" বললেন মামাবাবু।

বাপি একটু ইতস্তত করে শুরু করল, "আজ্ঞে, আপনি তো জানেন ডক্টর সেনের কাছে আমার রিসার্চের বিষয়টা ?"

"খানিকটা শুনেছিলাম," বললেন মামাবাবু।

"আমার রিসার্চ ছিল ব্রেনের বিভিন্ন নার্ভ সেন্টারগুলো খুঁজে বের করা। স্নায়ুকোষের নানান কাজের ফলে যে সব ইলেকট্রিক্যাল ইমপাল্‌সের সৃষ্টি হয়, তা পরীক্ষা করা এবং বাইরে থেকে পাঠানো ইলেকট্রিক্যাল ইমপালসের সাহায্যে ওই সমস্ত নার্ভ সেন্টারগুলোকে কৃত্রিম উপায়ে স্টিমিউলেট করা। জন্তু-জানোয়ার নিয়েই বেশির ভাগ এক্সপেরিমেন্ট করছিলাম। ভাবলাম, আমার বিদ্যেটা একটু হাতে-কলমে কাজে লাগাই।"

"তা এই সার্কাসে জুটলে কী ভাবে ?" জিজ্ঞেস করলেন মামাবাবু।

"আজ্ঞে, এই জুবিলি সার্কাসের মালিক-কাম-ম্যানেজার মুথুস্বামীর সঙ্গে আমার আলাপ ছিল। যে লোকটি জাগলিং আর মাছসুদ্ধু জল খাওয়ার খেলা দেখায়, ওই মুথুস্বামী। বছর পাঁচেক আগে সোদপুরে আমার মামারবাড়ির কাছে যখন ওরা শো দিতে গিয়েছিল তখন পরিচয় হয়। সার্কাস আমার দারুণ ভাল লাগে। সুযোগ পেলেই তাই সার্কাসের লোকদের সঙ্গে ভাব জমাই। মুথুস্বামীর সঙ্গে ফের দেখা হল বছর-দেড়েক আগে ওই সোদপুরে। ওরা আবার খেলা দেখাতে এসেছিল। মুথুস্বামী দুঃখ করে বলল যে, তার সার্কাসের হাল খুব খারাপ। টিকিট বিক্রি কমে গেছে। পয়সার অভাবে নতুন সাজ-সরঞ্জাম কিনতে পারছে না। ভাল নতুন আর্টিস্ট আনতে পারছে না। নতুন তেজি পশুপাখি কেনার পয়সা নেই। ঠিকমতো মাইনে দিতে না পারায় কয়েকজন ভাল খেলোয়াড় অন্য সার্কাসে চলে গেছে। বাজারে ধার জমেছে। এরকম চললে সার্কাস বিক্রি করে দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। তখনই আমার মাথায় এই আইডিয়াটা আসে। মুথু একটু দোনামনা করে রাজি হয়ে গেল আমার কথায়। কী করবে, বেচারার তখন নিরুপায় অবস্থা।

তা আমার এক্সপেরিমেণ্ট সাকসেস্‌ফুল। টিকিট সেল খুব বেড়েছে। ধার শোধ হয়ে গেছে। মুথুস্বামীর হাতে এখন দু-পয়সা জমেছে। এবার ওর সার্কাসের চেহারা ফিরে যাবে।

"ইলেক্‌ট্রোডগুলো জন্তুগুলোর রঙের সঙ্গে মিলিয়ে এমন ভাবে রাখা আছে যাতে দূর থেকে দেখলে মোটেই ধরা না যায়। তবে আপনার ট্রেণ্ড চোখ, আবার বায়নাকুলার দিয়ে দেখলেন। এই ভয়েই বড় শহরে খেলা দেখাতে যাইনি। পাছে আপনাদের মতো সায়ান্টিস্টদের কাছে ধরা পড়ে যাই।" বাপি ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল।

"তুমি কি সারাজীবন এই করবে ?" মামাবাবু কড়া গলায় জানতে চাইলেন।

"না, না, তা কেন করব," বাপি আপত্তি জানাল, "এক বছরের কন্ট্রাক্ট। আর তিন মাস বাকি। ব্যস্, তারপরে আমার ছুটি। ফের তখন ডঃ সেনের কাছে রিসার্চে ঢুকব। তবে সার্কাসের লাইফটা কিন্তু ভারী ইন্‌টারেস্টিং।"

"প্লিজ একটু বুঝিয়ে বলবেন," আমি আর ধৈর্য রাখতে পারি না। "জন্তুগুলোর ভাষা বোঝার খেলার সঙ্গে আপনার কী সম্পর্ক ?"

বাপি সপ্রশ্নভাবে মামাবাবুর দিকে চাইল। মামাবাবু বললেন, "দাও বুঝিয়ে, তবে অল্প কথায়।"

"অলরাইট," বাপি নিজের মাথায় একটা টোকা দিয়ে বলল, "এই হচ্ছে আমাদের মস্তক, মানে মাথা। এই মাথার নীচে আছে ব্রেন, মানে মগজ। অতি রহস্যময় এবং দরকারি বস্তু। এর জোরেই আমরা করে খাই। মগজে আছে কোটি কোটি নিউরোন অর্থাৎ স্নায়ুকোষ। মগজের ভিতরে এক-এক জায়গাকার স্নায়ুকোষের কাজ এক-এক রকম। মগজের এই স্নায়ুকোষগুলির নির্দেশেই আমরা এক-এক ধরনের কাজ করি।

"বাইরের পরিবেশে কত রকম ঘটনা ঘটছে, সেই সব খবর আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয় গ্রহণ করে এবং স্নায়ুতন্ত্র মারফত তা ক্রমাগত ব্রেনে গিয়ে পৌঁছয়। জানেন তো, আমাদের শরীরে প্রায় সব জায়গাতেই আছে স্নায়ুকোষ এবং স্নায়ুকোষগুলি পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত। মগজ বা মস্তিষ্কই হচ্ছে স্নায়ুতন্ত্রের প্রধান। কোনও খবর আমাদের মগজে পৌঁছনোমাত্র মগজ ঠিক করে ফেলে এর ফলে আমাদের শরীরে কী কী প্রতিক্রিয়া হওয়া উচিত এবং সেই অনুযায়ী নির্দেশ দেয়।

"যেমন ধরুন, চোখে একটা কিছু দেখলাম। চোখের স্নায়ুতন্ত্র দিয়ে সেই ঘটনা পৌঁছে যাবে মগজে। মগজ হয়তো তৎক্ষণাৎ ঠিক করে ফেলবে যে, এই দৃশ্য দেখে আমার চটে যাওয়া উচিত। অমনি ব্রেনের যে স্নায়ুকোষগুলি রাগকে চালনা করে সেই কোষগুলি স্টিমিউলেটেড হবে, অর্থাৎ উদ্দীপিত হয়ে উঠবে এবং ওই কোষগুলি শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ পাঠাবে। যেমন ধরুন, আমার শরীর হয়তো গরম হয়ে উঠবে, হয়তো আমার চোখ বড় বড় হবে বা পেশী শক্ত হয়ে উঠবে।

"আবার যদি দৃশ্যটায় আনন্দ হওয়া উচিত বলে মনে করে ব্রেন, তাহলে প্লেজার সেণ্টার বা স্ফূর্তির কেন্দ্রে খবর যাবে। প্লেজার সেণ্টারের স্নায়ুকোষগুলি উদ্দীপিত হবে এবং তাদের নির্দেশে আমি স্ফূর্তির লক্ষণ দেখাব। যেমন, হাসতে পারি দাঁত বের করে, বা হো-হো করে। হয়তো আনন্দে গড়াগড়ি

ডবল P মানে ডবল পাওয়ার

National নিপ্পো

স্পেশাল ব্যাটারি

যখন অন্যান্য ব্যাটারি লিক করতে ও শেষ হতে সুরু করে, তখন নিপ্পো স্পেশাল বিনা বিরতিতে চালু থাকে।

অভিজ্ঞ ইঞ্জিনীয়ারদের তদারকিতে শ্রেষ্ঠ মানের কাঁচা উপাদানে নিপ্পো প্রস্তুত করা হয়। গত ১১ বছর ধরে ক্রেতাদের পছন্দের তালিকায় সেরা জিনিসটি এখন তার ১০০ কোটিতম সেল উৎপাদনের উৎসব পালন করছে।

এ ছাড়া রয়েছে অপ্রতিদ্বন্দ্বী বৈশিষ্ট্যগুলি ঃ

- টপ সীল, কারখানা-তাজা শক্তির গ্যারান্টি দেয়।
- ISI মার্কা—গুণমান সম্পর্কে আপনার ভরসা।
- জাপানের ন্যাশনাল থেকে বিশ্ব-শ্রেণীর প্রযুক্তিবিদ্যায় প্রস্তুত।
- আপনার কাছে পৌঁছবার আগে প্রতিটি ব্যাটারি-ইলেক্ট্রনিক উপায়ে পরীক্ষিত।

everest/d85/INL/83 ben

খাব, বা কুকুর হলে লেজ নাড়ব। সবই হবে আমার প্লেজার-সেন্টারের স্নায়ুকোষদের হুকুমে।

"মনে রাখবেন, বাইরের পরিবেশের প্রভাব ছাড়াও ব্রেন আমাদের চালায়। যদি সে মনে করে আপনার এখন ডান হাতখানা নাড়ানো উচিত, অমনি যে স্নায়ুকোষগুলি আপনার ডানহাতখানা চালনা করে, সেগুলি উত্তেজিত হয়ে নির্দেশ পাঠাবে এবং আপনিও আপনার ডান হাত নাড়াতে শুরু করবেন। নির্দেশ পাঠানো বন্ধ হলেই হাত নাড়া থেমে যাবে।

"এই ভাবে ব্রেনের স্নায়ুকোষ আমাদের চালায়। এখন পরীক্ষা করে জানা গেছে, প্রাণীর স্নায়ুকোষ উদ্দীপিত হলেই তাতে রাসায়নিক বিক্রিয়া হয়। এবং তার ফলে সেখানে ইলেকট্রিক্যাল ইমপাল্‌স অর্থাৎ বৈদ্যুতিক স্পন্দন সৃষ্টি হয়। খুব সূক্ষ্ম সেই স্পন্দন। এই বৈদ্যুতিক স্পন্দন বা বৈদ্যুতিক তরঙ্গ স্নায়ুতন্ত্রের পথ বেয়ে ছুটে চলে।

"দেখা গেছে, মানুষ এবং উন্নত প্রকারের মেরুদণ্ডী প্রাণীর মগজের গঠন প্রায় একই রকম। বৈজ্ঞানিকরা খুঁজে দেখছেন, নানারকম প্রাণীর মগজের কোন্ কোন্ অঞ্চল কী কী কাজ করে। ব্রেনের কোন্ কোন্ জায়গাকার নিউরোন স্টিমিউলেটেড হলে কী ধরনের কারেন্ট তৈরি হয়। তবে উন্নত প্রাণীর ব্রেনের বহু অংশের কাজই এখনও আমাদের অজানা। আবিষ্কারের চেষ্টা চলছে।

"বৈজ্ঞানিকরা প্রাণীদের মগজের নানা অনুভূতির কেন্দ্র, যেমন স্ফূর্তি, খিদে, রাগ, বেদনা, ঘুম ইত্যাদির নার্ভ-সেন্টারগুলিকে কৃত্রিম উপায়ে স্টিমিউলেট করতে চেষ্টা করছেন। ব্যাপারটা এমন কিছু কঠিন নয়। খুলি ফুটো করে খুব সরু একটা ইলেকট্রোডের মধ্য দিয়ে ইলেকট্রিক কারেন্ট পাঠাতে হবে। বিশেষ শক্তির বৈদ্যুতিক তরঙ্গ। তাহলেই যেখানে ইলেকট্রোডের ডগাটা ছুঁয়েছে সেখানকার স্নায়ুগুলি স্টিমিউলেটেড হবে এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশ পাঠাবে। আবার কারেন্ট পাঠানো বন্ধ করলেই কোষগুলি নিস্তেজ হয়ে পড়বে এবং নির্দেশ পাঠানো বন্ধ হবে। আমার সার্কাসের এক্সপেরিমেন্টও এই কায়দায় হচ্ছে।"

এতক্ষণ মন্ত্রমুগ্ধের মতন শুনছিলাম এই আশ্চর্য বৈজ্ঞানিক বিবরণ। এবার জিজ্ঞেস করলাম, "ইলেকট্রোড কী?"

বাপি একটা লম্বা দম নিয়ে মামাবাবুর দিকে করুণ চোখে তাকিয়ে বলল, "উঃ, গলাটা শুকিয়ে গেছে। একটু চা-টা যদি—"

মামাবাবু ব্যস্ত হয়ে বললেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়। দ্যাখো কাণ্ড, খেয়ালই নেই। সুনন্দ, যাও তো একটু ব্যবস্থা করো।"

সুনন্দ ভিতরে উঠে গেল।

চা-টায়ের আশ্বাসে খুশি হয়ে বাপি আমার দিকে ফিরে বলল, "ইলেকট্রোড কী জানেন, সোজা কথায় খুব সরু শক্ত বিদ্যুৎ পরিবাহী তার। তারের গা-টা ইনসুলেটেড করা। কেবল ডগায় একটু চেঁছে ধাতু বের করা। তারের অন্য প্রান্তের সঙ্গে যোগ থাকবে ব্যাটারির। ইলেকট্রোডের ডগাটা ব্রেনের যে অনুভূতির কেন্দ্রকে চাগাতে চাই সেখানটা ছুঁয়ে থাকবে।"

সার্কাসের জানোয়ারদের মানুষের ভাষা বোঝার খেলার রহস্যটা এবার আমার কাছে খানিক পরিষ্কার হল। বললাম, "আচ্ছা সার্কাসের ভাল্লুকটা যে ঘাড় নাড়ল, হাত নাড়ল সেটা কি ওই?"

বাপি হেসে বলল, "হ্যাঁ, ওই ইলেকট্রোডের মহিমায়।"

"আচ্ছা বাঁদরটা কেন হঠাৎ কলা খাওয়া থামাল?" প্রশ্নটা সুনন্দর। সে ইতিমধ্যে চায়ের ব্যবস্থা করে ফিরে এসেছিল।

বাপি বলল, "ওর খিদে মিটে যাওয়ার নার্ভ-সেন্টার চাগিয়ে দিতেই ও খাওয়া থামায়। আবার হাঙ্গার-সেন্টারকে স্টিমিউলেট করলেই খেতে চায়।"

"আর কুকুরটা যে চটে গেল?" সুনন্দর কৌতূহল মেটেনি।

"নিজে থেকে চটেনি। আমিই চটিয়ে দিয়েছিলাম কৃত্রিম উপায়ে। ওর রাগের কেন্দ্রে ইলেকট্রোডের সাহায্যে ইলেকট্রিক কারেন্ট পাঠিয়ে। আবার কারেন্ট অফ করতেই শান্ত হয়ে গেল।"

মামাবাবু বললেন, "হুম। আমি বায়নাকুলার দিয়ে ওই কুকুরটার মাথাতেই একটা তার আটকানো দেখে ইলেকট্রোড বলে সন্দেহ করেছিলাম। তা ওটা চার্জ করার ব্যাটারিটা কোথায় ছিল? বকলসের গায়ে?"

"আজ্ঞে ঠিক ধরেছেন।" জবাব দিল বাপি।

চণ্ডী ট্রে হাতে ঢুকল ঘরে। ট্রে রাখা হল সামনের টেবিলে। তাতে চার কাপ চা। একটা প্লেটে দু-টুকরো বড়-বড় কেক। এবং আরেকটা প্লেটে অনেকখানি চানাচুর।

বাপি সঙ্গে সঙ্গে একটা কাপ টেনে নিয়ে চায়ে একটা চুমুক দিয়ে গোটা একখানা কেক তুলে মুখে পুরল। মামাবাবু বললেন, "খাও খাও, কেক-টেক তোমার জন্যে। আমরা শুধু চা খাব।" ব্যস, বাপির কথা বন্ধ, মুখ ভর্তি। বোঝা গেল সে আর বৈজ্ঞানিক লেকচারে রাজি নয়।

মামাবাবু বললেন, "আমি একবার সরেজমিনে দেখতে চাই ব্যাপারটা। এখন নিয়ে যেতে পারবে তোমাদের সার্কাসে? এখন তো খেলার টাইম নয়।"

চানাচুর চিবুতে চিবুতে বাপি ঘাড় নেড়ে জানাল, হ্যাঁ।

জুবিলি সার্কাসের সামনে আমরা চারজন যখন সাইকেল-রিকশা থেকে নামলাম তখন সকাল প্রায় দশটা। বাপি আমাদের নিয়ে গেট খুলে খেলা দেখাবার বড় তাঁবুর ভিতর দিয়ে সোজা চলল। দুটি ছেলেমেয়ে তখন তাঁবুতে একচাকার সাইকেলের কসরত অভ্যাস করছিল। আরও দুটি লোক ঠকাঠক শব্দে গ্যালারির তক্তা পেটাচ্ছিল। তারা নিজেদের কাজ ফেলে অবাক হয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইল। বাপির দৃক্‌পাত নেই। আমরা বাপির পিছনে পিছনে হেঁটে তাঁবুর অন্য ধার দিয়ে বেরুলাম। এটা সার্কাসের পিছন দিক। এখানে সারি-সারি ছোট-ছোট তাঁবু। উনুনের ধোঁয়া উড়ছে। ঘরোয়া বেশে একটি মেয়ে মাটিতে চট পেতে বসে কী জানি সেলাই করছে। সার্কাসের স্ট্রংম্যান মিঃ ভীম, লুঙ্গি ও গেঞ্জি গায়ে একখানা ভিজে গামছা শুকোতে দিচ্ছে দড়িতে। এখানে-ওখানে জন্তুদের খাঁচাগুলো।

বাপি আমাদের নিয়ে কাছেই একটা তাঁবুর সামনে হাজির হল। তাঁবুর পর্দা তোলা। দেখলাম মুথুস্বামী ভিতরে চেয়ারে বসে টেবিলে রাখা একটা মোটা খাতায় কিছু লিখছে ঝুঁকে। তাঁবুর ভিতরে আরও কয়েকখানা চেয়ার। আমাদের পায়ের শব্দে মুথুস্বামী চোখ তুলে তাকিয়ে ভুরু কোঁচকাল। আমাদের

একটু অপেক্ষা করতে বলে বাপি ঢুকে গেল তাঁবুতে।

মুথুস্বামীর সঙ্গে বাপি কী সব কথা বলল, আমাদের দেখিয়ে দেখিয়ে। মুথুস্বামী হন্তদন্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল। বেরিয়ে এসে আমাদের বলল, "গুড মর্নিং জেন্টেলমেন" এবং হ্যাণ্ডশেক করল আমাদের সবার সঙ্গে। তারপর সে মামাবাবুকে ভাঙা ভাঙা বাংলায় বলল, "আপনারা এই টেন্টে বসুন। এটায় জায়গা বেশি। এটা আমার অফিস। আমি আসছি।" এই বলে সে অত্যন্ত বিনীত ভাবে হেসে বিদায় নিল।

তাঁবুতে ঢুকে বসলাম চেয়ারে। মামাবাবু জিজ্ঞেস করলেন বাপিকে, "কী বললে তুমি আমাদের সম্বন্ধে?"

বাপি হেসে বলল, "বললাম, আপনি আমার এক্স প্রফেসর। নামকরা সায়ান্টিস্ট। আর অন্য দুজন আমার ক্লাসমেট ছিল। আপনারা সার্কাস দেখতে এসে জন্তুদের ভাষা বোঝার রহস্যটা ধরে ফেলেছেন এবং আমার এক্সপেরিমেন্টটা দেখতে চান। আমি আসছি এক্ষুনি।" এই বলে বাপি উধাও হল।

মিনিট দু-তিন বাদেই বাপি ফিরে এল, সঙ্গে কুকুর পঞ্চু। পঞ্চুকে আমাদের মাঝখানে রেখে নিচু হয়ে তার গায়ে হাত দিয়ে বাপি বলল, "এই দেখুন।" বলতে বলতেই সে চকিতে মাথা তুলে এক ধমক— "এই পটল, এখানে কী? ভাগ।"

আমরাও ফিরে দেখি, তাঁবুর দরজায় মাস্টার পটল উঁকি দিচ্ছে।

পটলের মুখে তখন রঙচঙ নেই। মাথায় টুপি বা হাতে কাঠটাও নেই। খালি পা। তবে ঢলঢলে পোশাকটা একই রকম। পটল তার বোঁচা নাক ও কুতকুতে চোখ কুঁচকে ঝট করে এক স্যালুট ঠুকে আমাদের দেখিয়ে বলল, "সিনেমার লোক বুঝি? তা স্যার শুধু পঞ্চুকে কেন, আমাকেও নিন। ফাইটিং হিরো। বই বেরুলেই হিট। দেখবেন সব হলে টিকিট ব্ল্যাক হবে।" এই বলে সে হাত-পা ছুঁড়ে এক রাউণ্ড ফাইট দেখিয়ে দিল।

বাপি তাড়া লাগাল, "পটল জ্বালাস নে। পালা বলছি। নইলে টঙে তুলে দেব। ডাকচি মাইকেলকে।"

শুনেই "উরে পিছিমা গো," বলে পটল পাঁই পাঁই করে মারল দৌড়।

"টঙ কী?" আমি জানতে চাইলাম।

"একটা খুব উঁচু টুল। পটলকে জব্দ করতে হলে ওর ওপর চড়িয়ে দেওয়া হয়। বেচারা আর নামতে পারে না। শাস্তিটা রিং-মাস্টার মাইকেলের আবিষ্কার। পঞ্চুকে একবার সিনেমায় অ্যাকটিং করতে নিয়েছিল। সেই থেকে পটল পিছনে লাগে। আসলে ও পঞ্চুকে খুব ভালবাসে। ওর কাছ থেকে পঞ্চুকে নিয়ে এলাম, তাই কৌতূহলে দেখতে এসেছে।"

আমরা এবার মন দিয়ে পঞ্চুকে দেখতে থাকি। বাপি পঞ্চুর মাথা ও ঘাড়ের লোম ফাঁক করে দেখাল, "এই যে ইলেকট্রোডের তার।"

দেখলাম, সাদা রঙের খুব সরু কয়েকটা তার পঞ্চুর মাথা থেকে নেমে এসে তার দু-ভাঁজ বকলসের ভিতর ঢুকে গেছে।

"এ যে অনেকগুলো তার," বলল সুনন্দ।

"হ্যাঁ, তিনটে। কারণ ওর মাথায় তিনটে ইলেকট্রোড বসানো আছে। তিন জায়গার নার্ভ-সেন্টার ছুঁয়ে আছে। বকলসে আটকানো ব্যাটারির সঙ্গে একটা করে ইলেকট্রোডের তার যোগ করা আছে।"

"মানে তিনটে ইলেক্ট্রোডের সঙ্গে তিনটে ব্যাটারি।" সুনন্দ জিজ্ঞাসা করল।

"হ্যাঁ, খুব ছোট-ছোট ব্যাটারি।"

আমি প্রশ্ন করলাম, "এই ভাবে ইলেকট্রোড বসানো থাকলে প্রাণীর ব্যথা লাগে না?"

"মোটেই না," বলল বাপি, "যখন খুলি ফুটো করে বসানো হয় তখন তাকে অজ্ঞান করে নেওয়া হয়। ইলেক্ট্রোডগুলো এত সরু যে প্রাণী তাদের অস্তিত্ব টেরই পায় না। একই প্রাণীর ব্রেনে একসঙ্গে কয়েকটা ইলেক্ট্রোড বসানো থাকলেও তার ব্রেনের ক্ষতি হয় না। এবং অনেকদিন এইভাবে রাখা যায়।"

মামাবাবু এতক্ষণ চুপ করে শুনছিলেন। এবার প্রশ্ন করলেন, "ডক্টর সেন, মানে তোমরা মানুষের ব্রেনে ইলেক্ট্রোড বসিয়েছ কখনও?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ," বলল বাপি, "মাত্র দু-বার। জানেন তো মানুষের মাথায় ইলেকট্রোড বসানো কী ঝামেলা। এক্সপেরিমেন্টের জন্য লোকই পাওয়া যায় না। আমরা সাধারণত উন্নত ধরনের মেরুদণ্ডী প্রাণী, যেমন, বাঁদর, বেড়াল, কুকুর এইসব নিয়েই পরীক্ষা করতাম। ওদের মস্তিষ্কের গঠন প্রায় মানুষেরই মতন। এই জন্যেই তো সার্কাসে খেলা দেখানোয় সুবিধে হয়ে গেল।" একটু দুষ্টু হাসল বাপি।

"হুম," মাথা নেড়ে মামাবাবু বললেন, "তুমি তো রিমোট-কন্ট্রোল করো, কীভাবে? তাহলে তো ট্রান্সমিটার চাই।"

"হ্যাঁ, ওই যে ট্রান্সমিটারটা, তাঁবুর কোণে চৌকির ওপর, ঝালর-লাগানো পাতলা কাপড়ে ঢাকা। ওটা খেলার সময় রিংয়ের ঠিক ধারে মাটিতে রাখা থাকে। লোকে বুঝতে পারে না জিনিসটা কী। ট্রান্সমিটারের সঙ্গে কয়েকটা ইলেকট্রিক তার লাগানো। ওই দেখুন গুটনো তার। তারগুলো এক খণ্ড কাঠের গায়ে আটকানো কয়েকটা সুইচের সঙ্গে যোগ করা। ওই যে সুইচ-বোর্ড। খেলার সময় সুইচ-বোর্ডটা থাকে দূরে আমার কাছে। আর ইলেকট্রিক তারগুলো মাটিতে এমনভাবে বিছানো থাকে যাতে করে দর্শকের নজরে না পড়ে। আর পড়লেই বা কী? ওর আসল উদ্দেশ্য কার মাথায় আসবে? আমি সুইচ টিপে ট্রান্সমিটার কন্ট্রোল করি। সুইচ্ অন করলে ট্রান্সমিটার থেকে রেডিও-ওয়েভ পাঠানো যায়। জন্তুদের বকলসের ভিতর ব্যাটারির সঙ্গে এমন ব্যবস্থা আছে যাতে ওই ওয়েভ ধরা পড়ে এবং বেতার-তরঙ্গ বিদ্যুৎ-তরঙ্গে রূপান্তরিত হয়ে ইলেকট্রোডের মাধ্যমে মগজের অনুভূতি কেন্দ্রে গিয়ে ঘা দেয়।"

মামাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "আলাদা আলাদাভাবে ইলেকট্রোডগুলো চালু করো কী ভাবে?"

বাপি বলল, "রেডিও-ওয়েভ লেংথ্ চেঞ্জ করে। আমি আলাদা আলাদা সুইচ্ টিপলে আলাদা আলাদা লেংথের রেডিও-ওয়েভ ট্রান্সমিটার থেকে বার হয়। এবং ব্যবস্থামতো এক-একটা ইলেক্ট্রোড এক-একরকম রেডিও ওয়েভ লেংথে চালু হয়। সুইচ্ বন্ধ করলে ইলেক্ট্রোডও অফ্ হয়ে যায়।"

মামাবাবু বললেন, "এমন আশ্চর্য যন্ত্রটা বানাল কে? তুমি না ডক্টর সেন?"

বাপি বলল, "আজ্ঞে স্যারের কাছ থেকেই শিখেছিলাম

মেকানিজমটা। উনি সুইডেনের এক বৈজ্ঞানিকের কাছ থেকে যন্ত্রের ডিজাইনটা জেনে এসেছিলেন।"

মামাবাবু গম্ভীরভাবে বললেন, "এই সিক্রেট তুমি এভাবে সার্কাসের খেলায় লাগাচ্ছ জানলে ডঃ সেন কি খুব খুশি হবেন?"

বাপি একেবারে মামাবাবুর পায়ের কাছে হামলে পড়ল, "প্লিজ প্রফেসর ঘোষ, দয়া করে স্যারকে বলবেন না এই সার্কাসের কথা। এ-বিদ্যে আমি আর কাউকে শেখাইনি। সার্কাসের লোকে কেউ-কেউ জানে এটা একটা বৈজ্ঞানিক কৌশল। ব্যস্, ওই পর্যন্ত। এর মাথামুণ্ডু কিছু বোঝে না। আবার কেউ ভাবে এটা ভুতুড়ে অলৌকিক ব্যাপার। ভয়ে তারা বাক্সটা ছোঁয় না অবধি। মুথুস্বামীর কড়া নিষেধ আছে এ-সম্বন্ধে একটি কথাও যেন কেউ বাইরে ফাঁস না করে। সার্কাসের প্লেয়ারদের মধ্যে ওর ছেলে, মেয়ে, জামাই, ভাইপো এমন আত্মীয়র সংখ্যাই বেশি। এবং সবাই খুব বিশ্বাসী। সার্কাসের সবাই বোঝে ব্যাপারটা ফাঁস হয়ে গেলে সার্কাসের সর্বনাশ হবে, ফলে তাদেরও রুজি নষ্ট হবে।"

"ডঃ সেন এই এক্সপেরিমেণ্টটা করছিলেন কেন? ডাক্তারিতে কি কাজে লাগবে?" জিজ্ঞেস করল সুনন্দ।

বাপি বলল, "অনেক অনেক কাজে। এর বিরাট ফিউচার। যেমন ধরো, একজন মানসিক রুগি সর্বদা বিষণ্ণ। অর্থাৎ তার ব্রেনে ফুর্তি বা আনন্দের উৎস যে নার্ভ-সেণ্টার সেটা ঠিকভাবে কাজ করছে না। বাইরে থেকে যদি কৃত্রিম উপায়ে ওই স্নায়ুগুলোকে চাঙ্গা করা যায়, তাহলে রুগি তার মনের ফুর্তি ফিরে পাবে। সুস্থ হয়ে উঠবে।

"আবার পশুদের ওপর এক্সপেরিমেণ্ট করে দেখা গেছে যে, রাগ ভয় উত্তেজনা অতিরিক্ত হলে তাদের শরীরে নানা রকম রোগ দেখা যায়। মানুষের বেলাতেও ওই একই ব্যাপার ঘটে। তাই আমি সার্কাসের জন্তুদের বেশি রাগাতে বা উত্তেজিত করতে চাই না। যাহোক, এই ধরনের রোগ হবার কারণটা বোঝা গেলে, ওষুধ দিয়ে তার মানসিক উত্তেজনা কমিয়ে স্নায়ু সুস্থ করে তুললে, রোগও ভাল হয়ে যাবে। এছাড়াও আরও অনেক সম্ভাবনা আছে। পৃথিবীর নানান জায়গায় এই নিয়ে রিসার্চ চলছে।"

তাঁবুর দরজায় মুথুস্বামী দেখা দিল। পিছনে একটি লোকের হাতে ট্রে-তে সাজানো পাঁচ কাপ গরম কফি। ট্রে রাখল টেবিলে। মামাবাবু ব্যস্ত হয়ে বললেন, "আহা এখন কফি কেন? ছি-ছি অসময়ে হাঙ্গামা।"

মুথুস্বামী বলল, "প্লিজ কফি খান। আমি শুনেছি আপনি একজন ফেমাস্ সায়াণ্টিস্ট। সায়াণ্টিস্টদের কাছে আমি খুবই কৃতজ্ঞ।" সে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে বাপির দিকে তাকাল। বাপি খোশমেজাজে মাথা নেড়ে তক্ষুনি এক কাপ কফি তুলে নিল। মুথুস্বামীও আমাদের সঙ্গে কফি পান করতে বসল। বৈজ্ঞানিক আলোচনার ওখানেই ইতি। বাপি ইঙ্গিত করতে ট্রে-বাহী লোকটি পঞ্চুকে নিয়ে চলে গেল।

কফি খেয়ে তাঁবু থেকে বেরুতেই দেখি মাইকেল দাস দূরে দাঁড়িয়ে। সে আমাদের দিকে চেয়ে একবার হাসল। ও হয়তো বুঝতে পেরেছিল আমাদের আগমনের উদ্দেশ্য। মাইকেল কিন্তু কাছে এগিয়ে এল না। বোধহয় ওর সঙ্গে যে আমাদের আলাপ হয়েছে তা মুথুস্বামী বা বাপির সামনে প্রকাশ করতে

নারাজ। আমরাও পরিচয়টা চেপে গেলাম।

গেট থেকে বিদায় নেবার মুখে মুথুস্বামী বলল, "মিস্টার রায়ের এক্সপেরিমেণ্টের কথাটা আপনারা বাইরে প্রকাশ করবেন না, প্লিজ। তাহলে আমাদের সার্কাসের খুব লোকসান হবে, বুঝতেই পারছেন—"

মামাবাবু আশ্বাস দিলেন, "না না, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।"

আমরা রিক্শায় ওঠার সময় বাপি হেসে বলল, "যাক বাঁচলাম, ভয় হচ্ছিল স্যারকে বুঝি বলে দেবেন গিয়ে।"

"হুঁ, তাই দেব," মামাবাবু ধমকালেন, "সার্কাসে আর তুমি বেশি দিন থাকলে ঠিক জানিয়ে দেব ডঃ সেনকে।"

বাপি হাত কচলাতে কচলাতে বলল, "আর তিন মাস। ব্যস, তারপর আর একটা দিনও নয়। ফিরে গিয়ে স্যারের কাছে তেড়ে রিসার্চে লাগব। কথা দিচ্ছি।"

"ঠিক আছে, আমিও খোঁজ রাখব।" মামাবাবু ওয়ার্নিং দিলেন।

আরও চারটে দিন কেটে গেল। সার্কাসের দিকে আর যাইনি। বাপির সঙ্গেও আর দেখা হয়নি। পঞ্চম দিন সকালে বাপি আমাদের বাড়িতে এসে হাজির। দু-একটা দায়সারা কথার পর চোখ মিটমিট করে বলল, "আপনারা আজ একবার সার্কাসে চলুন। একটা মজা হবে। লাস্ট শো আটটায়, যাবেন।"

"কী মজা?" জানতে চাইলাম।

বাপি রহস্যময় ভাবে বলল, "হেঁ-হেঁ, সেটা এখন বলব না, পরে। যাবেন কিন্তু। নইলে খুব মিস্ করবেন।"

অবশ্যই সেদিন আমরা গেলাম সার্কাসে, আটটার শোয়ে।

বসলাম দু-টাকার সিটে। দেখলাম রাতের শোয়েও দর্শকের ভিড় বেশ। বোধহয় আজব খেলার খবরটা খুব ছড়িয়েছে।

খেলা যথারীতি শুরু হল। লক্ষ করলাম, দু-টাকার সিট থেকে বেশ খানিক তফাতে, এক টাকার গ্যালারি যেখানে শেষ হয়েছে তার কাছে খেলা দেখাবার গোল ঘেরা জায়গা অর্থাৎ রিংয়ের ঠিক ধারে দু'জন লোক পাশাপাশি চেয়ারে বসে। লোকদুটি অচেনা। একজনের গায়ে ছাইরঙা স্যুট। বেঁটেখাটো ভারী চেহারা, মোটা গোঁফ। অপরজনের পরনে হলুদ রঙের স্পোর্টস গেঞ্জি, কালো ট্রাউজার্স এবং মাথায় সাদা কাউন্টি ক্যাপ। এই লোকটি মাথায় লম্বা, দোহারা শক্ত গড়ন। দু'জনেই মাঝবয়সী এবং ভারিক্কি ধরন। মনে হল লোকদুটি হোমরা-চোমরা কেউ হবে। নইলে অমন রিংয়ের ধারে আলাদা করে বসাবে কেন? কাপড়ে ঢাকা ট্রান্সমিটারের বাক্সটাও দেখলাম। রিং ঘেঁষে মাটিতে রাখা।

খেলা চলতে চলতে বাঁদর মানিকচাঁদের খেলা শুরু হল। আজ সে দর্শকদের অনুরোধে লেজ নাড়া দেখাল এবং থামতে বলা মাত্র থামল। এইসময়ে দেখি মুথুস্বামী এসে আলাদা চেয়ারে বসা লোকদুটির কাছে গিয়ে দাঁড়াল। কী জানি কথা বলল দুজনের সঙ্গে। তারপর মুথুস্বামী চলে গেল তাঁবুর বাইরে। এবং ট্রেনার মাইকেল দাস মানিকচাঁদের থেকে খানিক তফাতে গিয়ে দাঁড়াল।

এবার টুপি-পরা লোকটি চেয়ারে বসে বসেই একটু ঝুঁকে নিচু গলায় কিছু বলল মানিকচাঁদকে। অমনি বাঁদরটা রেগে দাঁত খিঁচোতে খিঁচোতে খুঁটি ধরে ঝাঁকাতে লাগল। কাউন্টি-ক্যাপ চমকে পিছিয়ে বসলেন। তাঁর মুখ নড়ছে। মনে হল কিছু বলছেন। ফের মানিকচাঁদ শান্ত। বোধহয় বৈগুতিক বুঝে ক্যাউন্টি-ক্যাপ মাফ চেয়ে নিয়েছেন মানিকচাঁদের কাছে। বাঁদরের খেলা আর হল না। মানিকচাঁদ ফিরে গেল। সেই স্পেশাল দর্শক দুজন গুম মেরে বসে রইলেন।

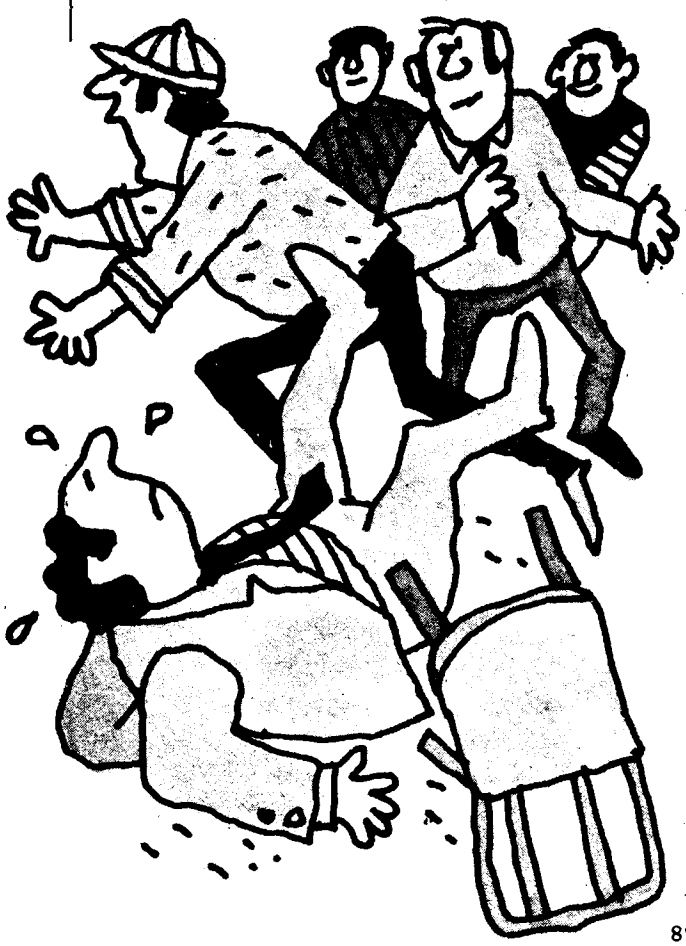

বাপিকে দেখলাম তাঁবুর গা ঘেঁষে ভালমানুষের মতো একটা টুলে বসে রয়েছে। কে বলবে, উনিই এই রহস্যের আসল মেঘনাদ।

পঞ্চু কুকুর এল। অন্যান্য খেলা দেখানোর পর সেও দেখাল মানুষের ভাষা বোঝার কেরামতি। এবারও সেই কাউন্টি-ক্যাপ পরা দর্শকটি কিছু বলল পঞ্চুর উদ্দেশে। অমনি পঞ্চু রাগে গরগর করে উঠল। কাউন্টি-ক্যাপ আবার কিছু বলামাত্র পঞ্চু ঠাণ্ডা। বিশিষ্ট দর্শক দুজন পরস্পর চোখাচোখি করলেন।

ভাল্লুক জাম্ববানের খেলার সময়ও সেই একই ঘটনা। তবে এবার ব্যাপারটা কিঞ্চিৎ গুরুতর দাঁড়াল।

জাম্ববান নিজের খেলা অর্থাৎ দর্শকদের কথামতো এক্সারসাইজ দেখানো শেষ হলে লক্ষ করলাম মুথুস্বামী এসে ওই দুই খাতিরের দর্শককে কিছু বলল। দুজনের মধ্যে স্যুট-পরা রাশভারী লোকটি এরপর হাত নেড়ে কী সব ইশারা করলেন। সঙ্গে সঙ্গে মাইকেল সমেত সার্কাসের সব লোকজন চলে গেল খেলার তাঁবুর বাইরে। বেঁটে জোকার মাস্টার পটলও একছুটে পালাল। বাপিও লুকলো পর্দার পিছনে। অর্থাৎ সার্কাসের লোকজনরা সবাই চোখের বাইরে গেল।

অন্য দর্শকরা অবাক। ভাবছে, এ নিশ্চয় নতুন কোনও খেলা। দেখলাম তাঁবুর কাপড় ফাঁক করে বাপির মুখ উঁকি মারছে। এবার সেই স্যুট-পরা ভদ্রলোক কিছু বললেন জাম্ববানকে উদ্দেশ করে। জাম্ববান নির্বিকার। লোকটি নিচু স্বরে কী জানি বলে চলেছেন।

হঠাৎ জাম্ববান বিকট গর্জন করে উঠল। তার শাঁকালুর মতো দাঁত এবং থাবার প্রকাণ্ড নখগুলো বিস্ফারিত। চোখ জ্বলছে। ভাগ্যিস সে বাঁধা ছিল খুঁটিতে, নইলে ভয়ঙ্কর কাণ্ড হতে পারত। দর্শকদের ভিতর বাচ্চারা চিৎকার করে কেঁদে উঠল ভয়ে। বড়দের অবস্থাও সঙ্গিন। বেশির ভাগই হুড়োহুড়ি করে দাঁড়িয়ে উঠল। কেউ-কেউ ছুটে গেল বেরুবার গেটের দিকে। রীতিমত এক বিপর্যয়।

স্পেশাল দর্শক দুজনও কম ঘাবড়াননি। জাম্ববানের রুদ্রমূর্তি দেখে কাউন্টি-ক্যাপ তৎক্ষণাৎ উঠে পিছনে মারলেন এক লাফ। আর স্যুট-পরা চমকে পিছু হটতে গিয়ে পড়লেন চেয়ার উলটে।

জুবিলি সার্কাসের মালিক, রিং-মাস্টার এবং আরও কয়েকজন দৌড়ে এল। স্যুট-পরাকে টেনে তুলল। রিং-মাস্টার মাইকেল দাস হাত নেড়ে জাম্ববানকে কিছু বলতেই সে আবার ঠাণ্ডা হয়ে গেল। দর্শকরাও ক্রমে শান্ত হয়ে যে যার আসন নিল। ওই দুই মাননীয় অতিথি কিন্তু আর খেলা দেখার জন্য বসলেন না। স্যুট-পরা লোকটি পোশাকের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে গটগট করে বেরিয়ে গেলেন, পিছু-পিছু কাউন্টি-ক্যাপ এবং তাদের পিছনে গেল বিব্রত মুথুস্বামী।

পরদিন ভোরেই বাপি আমাদের বাসায় হাজির। একগাল হেসে বলল, "কী, কেমন জমেছিল কাল?"

"কে ওরা দুজন? মানে রিংয়ের ধারে আলাদা বসেছিল,"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "খুব খাতিরের লোক বলে মনে হল ?"

বাপি বলল, "তা বটে। খাতিরের লোকই বটে। ডায়মণ্ড সার্কাসের ম্যানেজার আর রিং-মাস্টার। ডায়মণ্ড খুব বড় সার্কাস। কোত্থেকে খবর পেয়ে এসেছিল। পরশু আমাদের খেলা দেখল। তারপর ঝুলোঝুলি, এই কুকুর, বাঁদর, আর ভাল্লুকটাকে ওরা কিনবে। প্রচুর দাম দিতে চাইল। আবার লুকিয়ে-লুকিয়ে আমাদের রিং-মাস্টার মাইকেলকে টোপ দিয়েছিল মোটা মাইনের চাকরি। ওদের ধারণা, মাইকেলই এমন অদ্ভুত খেলা শিখিয়েছে। মানুষের ভাষা বোঝাটা আসলে ছল, খেলার কৌশল। যত বোঝাই ওদের ধারণা পালটায় না, কিছুতেই মানবে না।"

মামাবাবু বললেন, "অন্য ব্যাপারটা কী বললে ?"

লাজুক হেসে মাথা চুলকে বাপি জানাল, "বলেছি এ এক সাধুর কৃপা। হিমালয়ের ভারী জব্বর সাধু। মুথুস্বামী গিয়েছিল কেদার-বদ্রীনাথে তীর্থ করতে। তখন ওই সাধুর দেখা পায়। মুথুর সেবায় তুষ্ট হয়ে আর তার সার্কাসের দুরবস্থার কাহিনী শুনে সাধুজি বর দিয়েছিলেন যে, এক বছরের জন্য ওর সার্কাসের পশুরা কিছু-কিছু মানুষের ভাষা বুঝতে পারবে। ডায়মণ্ডকে যত বলা হয় এসব জন্তু বিক্রি করা হবে না, তবু নাছোড়বান্দা। কেবলই দর চড়ায়।

"শেষে তিতিবিরক্ত মুথু রেগেমেগে ভাবল, ব্যাটাদের কিঞ্চিৎ জব্দ করা যাক। আমিই দিলাম প্ল্যানখানা। মুথু ডায়মণ্ডের ম্যানেজারকে ডেকে বলল, এই জানোয়ারদের ইচ্ছের বিরুদ্ধে কিছু করলে ওদের এই বিশেষ ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যাবে। সাধুজির এই রকম নির্দেশ আছে। এরা কেউ জুবিলি ছেড়ে যেতে চাইবে কি না সন্দেহ। অনেক দিন আমাদের সঙ্গে আছে যে। আমাদের নিজের লোক হয়ে গেছে। যাহোক ভাষা বোঝার খেলা দেখানোর সময় আপনারা নিজেরাই ওই জানোয়ারদের জিজ্ঞেস করে দেখুন, ওরা ডায়মণ্ডে যেতে রাজি আছে কি না ? যে রাজি থাকবে, সে ফুর্তি দেখাবে। আর রাজি না থাকলে হয়তো রেগে যাবে। যে যে রাজি হবে তাদের আমি ছেড়ে দেব কথা দিচ্ছি।

"দেখলেন তো তারপর কাণ্ডটা ! বেচারিরা খুব নিরাশ হয়ে ফিরে গেছে। তবে সাধু-মহারাজের হদিস নিয়ে গেছে মুথুস্বামীর কাছ থেকে। মুথু বলেছে, সাধু গুহায় বাস করেন। কেদারতীর্থের পুব দিকের পাহাড়ে। তবে ঠিক কোন্ গুহায় ওঁকে পাওয়া যাবে বলা মুশকিল। মাঝে-মাঝে ডেরা পালটান কি না। পাহাড়িদের কাছে খোঁজখবর করলে হয়তো জানা যাবে।

"সাধুজির ইয়া তাগড়াই চেহারা। ছ' ফুট খাড়াই। টকটকে রঙ। মাথায় মস্ত জটা। ধবধবে পাকা দাড়ির বহর আড়াই হাত। খুব সাবধান। দিবারাত্র বুনো জন্তুরা তাঁর আস্তানার চারপাশে ঘোরাফেরা করে। সাধুজি হিংয়ের কচুরি খেতে ভীষণ ভালবাসেন। যোগাড় করে খাওয়াতে পারলেই নির্ঘাত বর লাভ।"

একটু মিচকে হেসে জানাল বাপি, "মনে হয় সামনের গ্রীষ্মেই ওরা হিমালয়ে ছুটবে সাধুজির খোঁজে।"

ছবি : দেবাশিস দেব

বিদ্যাদেবী

ভগীরথ মিশ্র

বিদ্যাদেবী সবার কাছে ভাল
তাঁর কাছে তো নেইকো সাদা-কালো।
বিদ্যে বিলোন সবার ঘরে ঘরে
নিক্তি ধরে ওজন করে করে।

ব্যস্ত থাকেন, পারেন নাকো যেতে
সবার কাছে সকল পরিক্ষেতে।
কারুর খাতায় বসেন নিজে গিয়ে,
কোথাও বা দেন হাঁসটাকে পাঠিয়ে ॥

তুতুলের পুতুল

সৌমিত্র বন্দ্যোপাধ্যায়

চোখ জুড়ে তার ঝরছে অঝোর ধারা
ছড়িয়ে আছে শেলেট, ছবি, ফুল,
আলগা হল মাথায় বাঁধা ফিতে
সকালবেলার হাওয়ায় কাঁপে চুল।

খাবার ঘরে তাড়াচ্ছে মা মাছি,
রান্নাঘরে কাজ তো পড়ে ছিষ্টি
বাড়ছে বেলা, কমছে না তো, বাড়ছেই
ঝরঝরানি টুপ্ টুপা টুপ্ বিষ্টি।

"কে বকেছে কে মেরেছে তোমায়
এমন করে কাঁদছ কেন তুতুল ?"
"থকাল থেকে পাত্তি না তো খুঁদে
হালিয়ে গেথে আমাল দে দল-পুতুল।"

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সদাশিব হৈ হৈ কাণ্ড চিত্রনাট্য : তরুণ মজুমদার ছবি : বিমল দাস

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

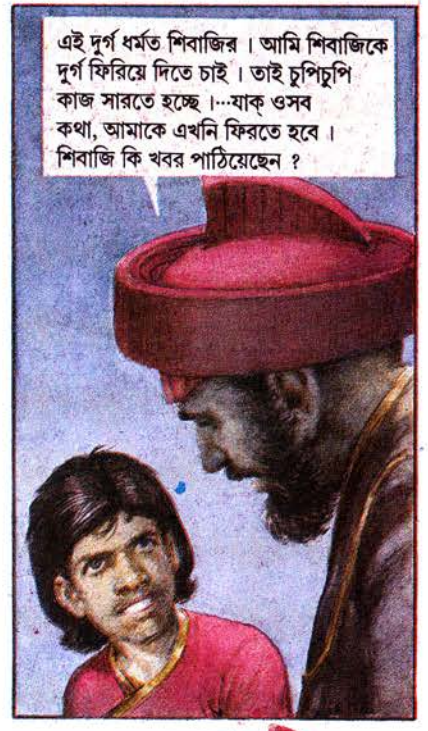

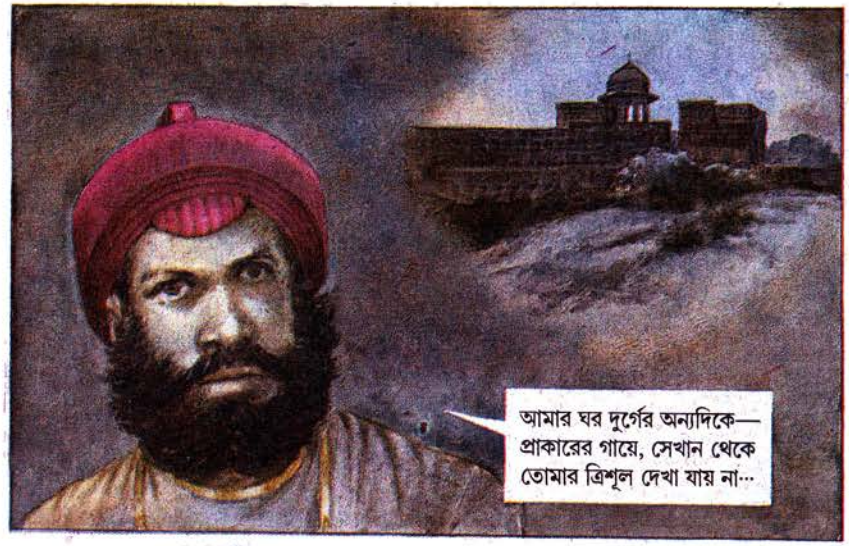

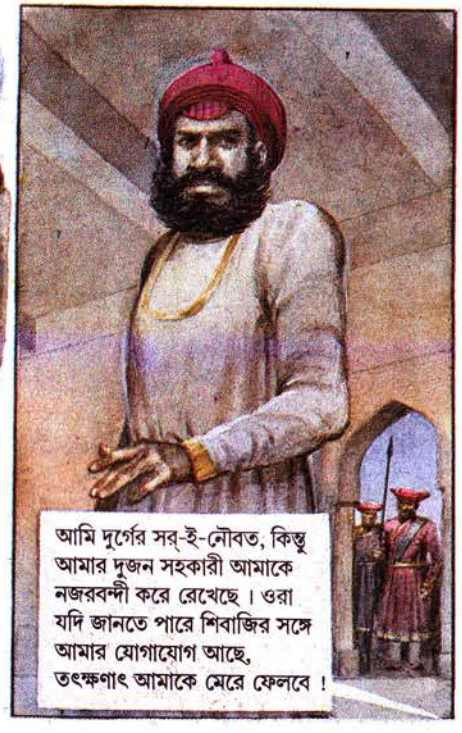

ছবি এঁকেছে **আবীর ভট্টাচার্য** (বয়স ৫)

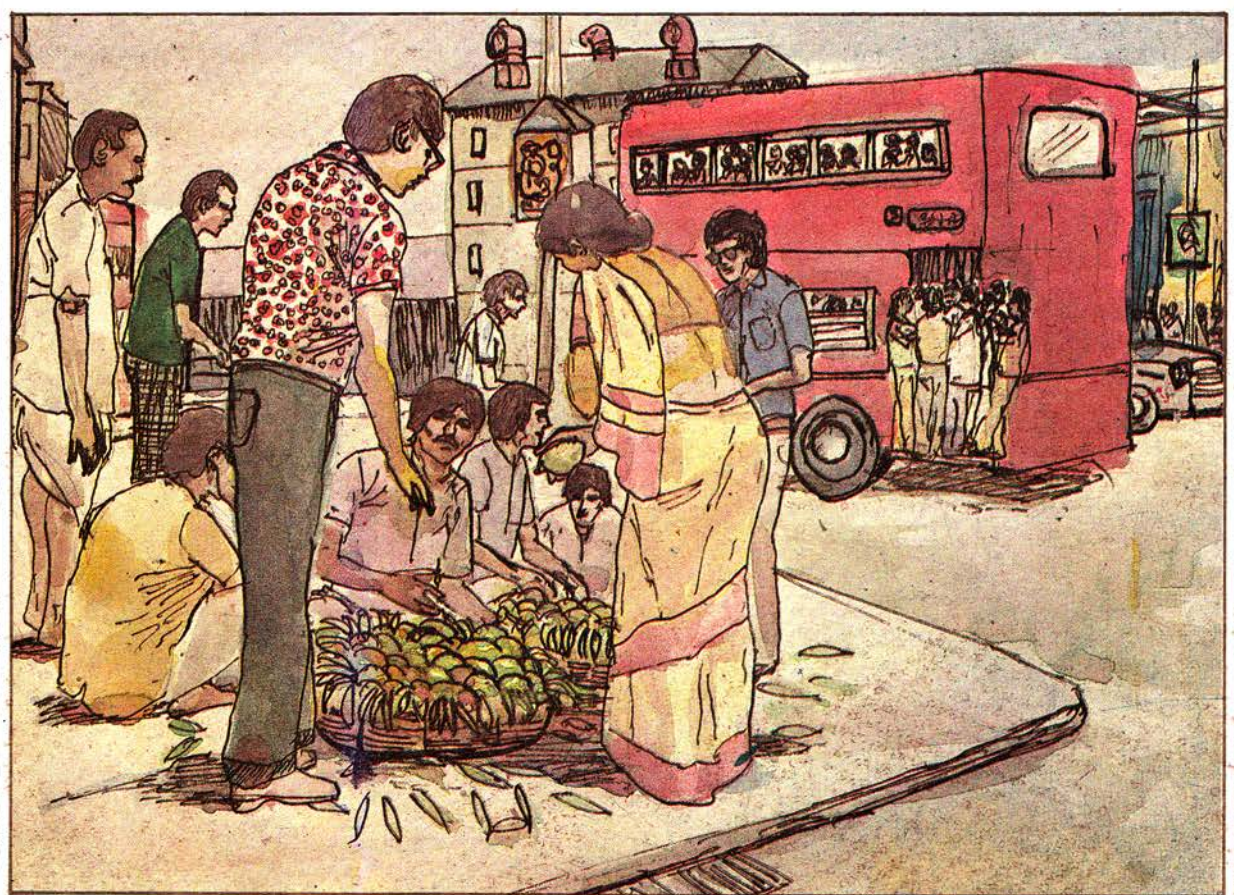

ছবি এঁকেছে **শমীককুমার ঘোষ** (বয়স ১৪)

বাঘের ছানা

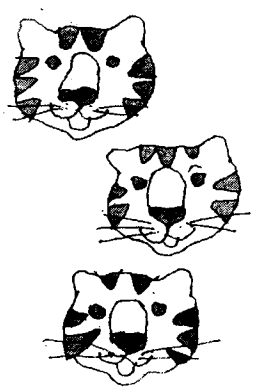

এক যে ছিল বাঘ
সে খেত পালংশাক।
বাঘের তিনটি ছিল ছানা
একটির নাম সোনা।
একটি চড়ে ঘোড়ায়
থাকত বসে মোড়ায়।
একটি ছিল ভাল
তার গায়ের রঙটি কালো।

অনামিকা দাস (বয়স ১২)

আমার বন্ধুরা

আমাদের বাড়িতে রোজ একটা কুকুর আসত, তার নাম কালু। আমরা যখন খেতে বসি কালু তখন এসে ঘেউ-ঘেউ করে। কালু মাংসের টুকরো দেখলে সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে আসে। খাওয়া শেষ হলে চলে যায়। কালুর একটা পা ভাঙা। কালু বিড়াল, ছাগল, পাখি, ইঁদুর দেখলে তেড়ে যায়।

কালু খুব ভাল কুকুর। আমি একদিন মামাবাড়ি যাচ্ছিলাম। কালু এসে আমার কাছে কুঁ-কুঁ করল, তখন আমি ওর মুখে খাবার দিলাম। ও চলে গেল।

কালুর সঙ্গে আমার খুব ভাব। কালু আমার কথা শোনে। কালুর লেজ ধরে টানলে,কান ধরে টানলে, ওর পিঠে বসলে, কালু কিছু বলে না।

প্রতিদিন সকালে আমাদের বাড়িতে অনেকগুলো চড়ুই আসে। আমার মাকে চড়ুইগুলো খুব ভালবাসে। আমাকে তত ভালবাসে না। মা প্রতিদিন ধান দেয় বলে পাখিগুলো মাকে ভালবাসে। একদিন আমি ওদের মুড়ি দিয়েছিলাম। ওরা খুব লক্ষ্মী হয়ে খাচ্ছিল। মা ধান দিল। ওরা মনের আনন্দে ধান খেল।

চড়ুই মুড়ির থেকে ধান বেশি ভালবাসে মনে হয়। ওদের ভয় নেই। ওরা ঘরেও আসে। খাটে-মেঝেতে যা-কিছু পড়ে থাকে তা খুঁটে খুঁটে খায়। ওরা আমার প্রিয় বন্ধু।

আমাদের বেড়াল মিনু খুব দুষ্টু। ও একবার আমাকে খিমচে দিয়েছিল। তাই ওর কথা লিখব না। তবে ওর জন্যে ঘরে ইঁদুর আসতে পারে না।

সায়ন্তন দাস (বয়স ৭)

আমার দাদা

আমার দাদার নাম বিনয়। সে আমার থেকে অনেক বড়। দাদা আমাকে সবসময় বলে হাঁদারাম। আমার নাম কিন্তু হাঁদারাম নয়। আমার নাম মানস।

সেদিন দাদাদের সঙ্গে আমাদের ফুটবল খেলা হয়েছিল। দাদারা আমাদের কাছে দু-গোল খেল, আমি আর আমার বন্ধু চন্দন গোল করলাম। দাদা কিন্তু বলল, "আরে আমি ছিলাম গোলকিপার। দেখলাম তুই আমার ভাই,গোল না দিতে পারলে কাঁদবি,তাই ছেড়ে দিলাম।"

আমি বললাম, "তুমি আবার কখন গোলকিপার থাকলে ? আর আমার গোলটা না-হয় ছেড়েই দিলে, চন্দনের গোলটা ধরতে পারলে না কেন ?"

আমার কথা শুনে দাদা এত রেগে গেল যে কোনও জবাবই দিল না।

মানস কুণ্ডু (বয়স ১১)

ছয় ঋতু

গ্রীষ্মকালে খটখটে রোদ
শুকিয়ে সব সাদা
বর্ষায় কালো মেঘ করেছে
রাস্তাঘাটে কাদা।
শরৎকালে আকাশেতে
মেঘ তো নেই কালো
হেমন্ততে পাকা ধানে
গোলা ভরে গেল।
শীতকালেতে হিমেল হাওয়ায়
লাগছে ভীষণ শীত
বসন্ততে কোকিল শোনায়
মিষ্টিমধুর গীত।

মৌসুমী ঘোষ (বয়স ১১)

বুটিদার ফেট্টি

সার আর্থার কোনান ডয়েল

আগে যা ঘটেছে : মায়ের মৃত্যুর পর হেলেন স্টোনার ও তার বোন জুলিয়ার অভিভাবক হন তাদের বদমেজাজি বিপিতা। মায়ের উইলে তাঁর টাকাকড়ি দুই মেয়ে ও বিপিতাকে দেওয়া হয়েছে। জুলিয়ার বিয়ে হবার কথা ছিল, কিন্তু তার আগেই সে মারা যায়। তারও আগে পরপর কয়েক রাত্রিতে সে শিসের শব্দ শুনেছিল। তার মৃত্যুকালীন উক্তি : বুটিদার ফেট্টি। কাছাকাছি কিছু বেদে রয়েছে, মাথায় তারা বুটিদার রুমাল বাঁধে। হেলেনও সম্প্রতি শিসের শব্দ শুনেছে। ভয় পেয়ে সে ছুটে এসেছে শার্লক হোমসের কাছে। হেলেন চলে যাবার পরে তার বিপিতা এসে হোমসকে ভয় দেখান। খোঁজ নিয়ে হোমস জানতে পারে যে, মেয়েদের বিয়ে হলে বিপিতা আর্থিক অসুবিধায় পড়বেন। হেলেনদের বাড়িতে এসে হোমস তদন্ত চালায়। ঘরের ঘুলঘুলি তার কৌতূহল জাগিয়েছে। বিপিতার ঘরের লোহার সিন্দুকের উপরে দুধের ডিশও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে তার। হোমস ও ওয়াটসন রাত কাটাবে কাছাকাছি একটা সরাইখানায়। যাবার আগে হোমস বলে যায়, বিপিতা বাড়িতে ফিরে শুয়ে পড়বার পরে হেলেন যেন তার ঘরের জানালায় একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে দেয়। তারপর···

হোমস লাফিয়ে উঠল। "আলোটা মাঝের জানলায় জ্বলছে! ওইটে আমাদের সংকেত। চলো, ওঠা যাক।" আমরা বেরিয়ে পড়লুম। বেরোবার আগে হোটেলের ম্যানেজারকে হোমস বললে, "আমরা এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। তিনি যদি রাত্তিরে আমাদের না ছাড়েন, তো হোটেলে আমরা না-ও ফিরতে পারি।" ঘোর অন্ধকারের মধ্যে আমরা পথে নামলুম। ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছিল। দূরে অন্ধকারের মধ্যে একটা মোমবাতির আলো লক্ষ করে আমরা এগিয়ে চললুম এক অজানা বিপদের মোকাবিলা করতে।

বাড়ির ভেতর ঢুকতে আমাদের কোনও অসুবিধে হল না। পুরনো বাড়ির পাঁচিল অনেক জায়গায় ভেঙে গেছে। গাছের সারির মধ্যে দিয়ে সাবধানে আমরা লনে পৌঁছলুম। তারপর লন পেরিয়ে যখন জানালা দিয়ে ঘরে ঢুকতে যাব, তখনই একটা ঝোপের মধ্যে থেকে একটা কদাকার কী যেন এসে ঘাসের ওপর গড়াগড়ি দিয়েই আবার চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে অন্ধকারের মধ্যে হারিয়ে গেল।

আমি রীতিমত ঘাবড়ে গিয়ে ফিসফিস করে বললুম, "ওটা কী বলো তো?"

হোমসও একটু হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। তাই বোধহয় ও আমার হাতটা শক্ত করে চেপে ধরেছিল। তারপর চাপা হাসি হেসে আমার কানে কানে বললে, "বেশ মজার গেরস্থালি বটে। ওটা সেই বেবুনটা।"

ডাক্তারের যে এই রকম বন্য জীবজন্তু পোষার শখ আছে তা আমি ভুলেই গিয়েছিলুম। হঠাৎ মনে পড়ল একটা চিতাও তো আছে। সঙ্গে সঙ্গে মনে হতে লাগল, যে-কোনও সময় সেটা আমাদের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়তে পারে। সত্যি কথা বলতে কী, হোমসের পেছন পেছন তার দেখাদেখি জুতো খুলে নিঃসাড়ে ঘরে ঢুকে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম। হোমস জানালাটা বন্ধ করে দিলে। মোমবাতিটা জানালা থেকে সরিয়ে এনে টেবিলের ওপর রাখলে। মোমবাতির আলোয় সারা ঘরটা হোমস দেখে নিলে। আমিও দেখলুম। দুপুর বেলায় যে রকম দেখেছিলুম, তার থেকে ভিন্ন রকম কিছু নজরে পড়ল না। আমার কাছে সরে এসে কানের সঙ্গে মুখ ঠেকিয়ে ফিসফিস করে হোমস বললে, "কোনও রকম শব্দ কোরো না। তা হলে আমাদের চাল ভেস্তে যাবে।"

ঘাড় নেড়ে বললুম, "বুঝেছি"।

"অন্ধকারে বসে থাকতে হবে। আলো জ্বললে ঘুলঘুলির ফাঁক দিয়ে দেখা যাবে।"

আমি যথাসম্ভব চুপিচুপি বললুম, "ঠিক আছে।"

"ঘুমিয়ে পোড়ো না যেন। তাহলে প্রাণ নিয়ে টানাটানি হতে পারে। রিভলভারটা হাতের কাছে রাখবে। দরকার হতে পারে। আমি বিছানার এক পাশে বসব। তুমি চেয়ারটায় বোসো।"

আমি খাপ থেকে রিভলভারটা বের করে টেবিলের ওপরে রাখলুম। হোমস সঙ্গে একটা ছিপছিপে লম্বা বেত নিয়ে এসেছিল। সেটাকে হোমস তার হাতের কাছে রাখলে। তারপর হাতের কাছে দেশলাইটা রেখে ফুঁ দিয়ে মোমবাতিটা নিভিয়ে দিলে। ঝপ করে অন্ধকার নেমে এল।

ওহ্, সেই রাতের গায়ে কাঁটা দেওয়া রক্ত জল করা অভিজ্ঞতার কথা আমি এ জীবনে ভুলব না। চারদিক একেবারে চুপচাপ। কানে কোনও শব্দই আসছিল না। এমনকী, হোমসের নিশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দও শুনতে পাচ্ছিলুম না। যদিও জানি যে, ঘরের মধ্যেই সে আছে এবং জেগেই আছে। অনুমান করতে পারছিলুম যে, ভেতরে-ভেতরে হোমসও খুব উত্তেজিত হয়ে আছে। জানালার পাল্লা বন্ধ করে দেওয়ায় ঘরে আলোর ছিটেফোঁটাও আসছিল না। নিরেট অন্ধকারের মধ্যে বসে আছি। মাঝে-মাঝে রাতচরা পাখির চিৎকার কানে আসছিল। এক সময় জানালার ওপাশ থেকে একটা গরর্‌রর্‌ গর্জন শুনে বুঝতে পারলুম, চিতাটাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। পনেরো মিনিট অন্তর অন্তর গির্জার ঘড়িতে ঘণ্টা শোনা যাচ্ছিল। যদিও ঠিক পনেরো মিনিট অন্তরই ঘণ্টা পড়ছিল, আমার কিন্তু মনে হচ্ছিল যেন অনেকক্ষণ পরে ঘণ্টা পড়ছে। এইভাবে এক সময় বারোটা বাজল। একটা বাজল। দুটো বাজল। এক সময় তিনটে বাজল। আমি ভাবলুম, আমাদের হয়তো কিছু ঘটে কি না দেখবার জন্যে সারা রাতই এইভাবে বসে থাকতে হবে। হঠাৎ ঘুলঘুলির ফাঁক দিয়ে আলোর ঝলকানি দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল। একটু পরে পোড়া তেলের আর লোহা বা ওই জাতীয় কোনও ধাতুকে গরম করলে যেমন গন্ধ বের হয়, সে-রকম গন্ধ নাকে এল। বুঝলুম পাশের ঘরে কেউ ঢাকা দেওয়া লণ্ঠন জ্বাললে। শুনলুম পাশের ঘরে কেউ পা টিপে টিপে চলাফেরা করছে।

একটু পরেই আবার সব চুপচাপ। কেবল গন্ধটা ক্রমেই বাড়তে লাগল। প্রায় আধ ঘণ্টা কান খাড়া করে বসে রইলুম। হঠাৎ একটা চাপা শব্দ কানে আসতে লাগল। কেতলিতে জল ফুটে গেলে যে রকম শব্দ হয়, অনেকটা সেই রকম শব্দ। শব্দটা শোনা মাত্রই হোমস ফস করে দেশলাই জ্বালিয়ে সেই দড়িটার ওপর পাগলের মতো সপাসপ বেত মারতে লাগল।

হোমস চেঁচিয়ে উঠল, "ওয়াটসন, দেখতে পেয়েছ? ওটাকে দেখতে পেয়েছ।"

আমি কিন্তু কিছুই দেখতে পাইনি। হোমস যখন দেশলাই জ্বালল তখন খুব চাপা একটা শিস আমি শুনতে পেয়েছিলুম। কিন্তু ঘোর অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ আলো জ্বলে ওঠায় আমার চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল। তাই হোমস বেত চালাচ্ছে এটা দেখেছিলুম, কিন্তু কার ওপর সে ওরকম নির্দয় ভাবে বেত চালাচ্ছিল সেটা দেখতে পাইনি। তবে হোমসের মুখে তখন রাগ আর ঘৃণা ফুটে বেরুচ্ছিল।

বেশ কিছুক্ষণ পাগলের মতো এলোপাথাড়ি বেত চালাবার পর হোমস ঠাণ্ডা হল। তারপর সে ঘুলঘুলির দিকে তাকিয়ে

আগামী সংখ্যায় শুরু হচ্ছে

শার্লক হোমসের

নতুন গোয়েন্দা-গল্প

বুড়ো আঙুলের কথা

রইল। হঠাৎ রাত্রির নিস্তব্ধতাকে খান খান করে ভেঙে উঠল আর্ত চিৎকারের পর চিৎকার। ভয়, রাগ আর যন্ত্রণা এই তিনে মিলে সে-আর্তনাদকে এমন ভয়ানক করে তুলেছিল যা যে না শুনেছে তাকে বলে বোঝানো যাবে না। তার পরের দিন আমরা খবর পেয়েছিলুম যে, সেই আর্তনাদ গ্রামের লোকেরাও শুনেছিল, তবে স্রেফ ভয়ে তারা কেউ বাড়ি থেকে বেরোয়নি। এখন স্বীকার করতে লজ্জা নেই, সেই সময়ে ওই প্রাণফাটা চিৎকার শুনে আমার নিজেরই হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল। আমি কোনও কথা না বলে হোমসের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলুম। হোমসও আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। এক সময় সেই রক্ত জল করা আর্তনাদ থেমে গেল।

একটু ধাতস্থ হয়ে হোমসকে জিজ্ঞেস করলুম, "কী, ব্যাপারটা কী!"

"সব শেষ হয়ে গেল," হোমস বললে। "সব দিক দিয়ে দেখলে এটাই হয়তো ভাল হল। আমরা এখন ডঃ রয়লটের ঘরে যাব।"

হোমস মোমবাতি জ্বাললে। আমরা বারান্দায় এলুম। হোমসের মুখ অসম্ভব রকম গম্ভীর। হোমস বারদুয়েক ডঃ রয়লটের ঘরে টোকা দিলে। কোনও সাড়া নেই। তখন হোমস দরজার হাতল ঘুরিয়ে ঘরে ঢুকলে। তার পিছু-পিছু আমিও ঢুকলুম। আমি রিভলভারটা বাগিয়ে ধরলুম।

ঘরে ঢুকে যে দৃশ্য চোখে পড়ল, তা দেখে আমি অবাক। টেবিলের ওপরে একটা ঢাকা-দেওয়া লণ্ঠন জ্বলছে। লণ্ঠনের ঢাকনাটা সরানো। লণ্ঠনের আলোটা গিয়ে পড়েছে লোহার সেফটায়। সেফটা খোলা। টেবিলের কাছে একটা কাঠের চেয়ারে রয়লট বসে ছিলেন। গায়ে একটা ছাই রঙের ড্রেসিং গাউন। পায়ে লাল রঙের টার্কিশ চটি। তাঁর কোলের ওপর সেই কুকুর-বাঁধা দড়িটা গোটানো রয়েছে। তার ঘাড়টা কাত করা। চোখের দৃষ্টি ঘরের ছাতের দিকে। তাঁর চোখের তারায় ফুটে উঠেছে সাংঘাতিক ভয়ের ভাব। কপালে একটা নতুন ধরনের হলদে পটি বাঁধা ছিল। পটিটায় খয়েরি রঙের ফোঁটা দেওয়া। আমাদের ঘরে ঢোকার শব্দ পেয়েও রয়লট কোনও সাড়াশব্দ দিলেন না।

"ওইটেই সেই ফেট্টি। বুটিদার ফেট্টি!" হোমস ফিসফিস করে বললে।

আমি এক পা এগিয়ে গেলুম। আর সঙ্গে-সঙ্গে রয়লটের কপালের অদ্ভুত পটিটা নড়ে উঠল। তাঁর মাথার ঘন চুলের জঙ্গল থেকে মাথা তুললে একটা সাপ!

"খরিশ জাতের সাপ। ভারতবর্ষের অতি বিষাক্ত সাপ। এর কামড় খাবার দশ সেকেণ্ডের মধ্যে ইনি মারা পড়েছেন। হিংসের পথে গেলে শেষ পর্যন্ত এই রকমই হয়। যে অপরকে বিপদে ফেলবার জন্যে ফাঁদ পাতে, একদিন সেই ফাঁদে পা দিয়ে সে নিজেই বিপদে পড়ে। আগে এই জীবটাকে এর গর্তে পুরে দিই। তারপর মিস স্টোনারকে তার মাসির বাড়িতে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করে পুলিশকে খবর দিলেই হবে।" হোমস বললে।

আমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে অত্যন্ত ক্ষিপ্রভাবে হোমস মৃত ডাক্তারের কোল থেকে ফাঁস দেওয়া দড়িটা তুলে নিলে। তারপর অব্যর্থ নিশানায় ফাঁসের দিকটা সাপটার দিকে ছুঁড়ে এক হেঁচকা টান লাগালে। ফাঁসটা সাপের মাথায় টেনে বসে গেল। তারপর খুব সাবধানে শরীর থেকে যতখানি সম্ভব দূরে রেখে সবসুদ্ধ সেফের মধ্যে ছুঁড়ে দিয়েই সেফের পাল্লাটা বন্ধ করে দিলে।

এই হল ডঃ গ্রিমসবি রয়লটের মৃত্যুর আসল কাহিনী। এর পরের ঘটনার কথা, কী করে আমরা মিস স্টোনারকে বুঝিয়ে-শুনিয়ে তাঁর মাসির বাড়ি হ্যারোতে পাঠিয়ে দিয়েছিলুম, কী ভাবে পুলিশ তদন্তে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হল যে, ডঃ গ্রিমসবি রয়লটের হিংস্র জীবজন্তু পোষার শখ থেকেই দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হল, এই সব বলে আমার কাহিনীকে আর বাড়াব না। আমার নিজের যা জানবার ছিল, সেটা পরের দিন ট্রেনে ফেরবার পথে হোমসের কাছে জেনে নিলুম।

হোমস বলতে লাগলে, "বুঝলে ওয়াটসন, আমি ভীষণ ভুল করতে যাচ্ছিলুম। এই কেসটা থেকে আমার এই শিক্ষা হল যে, সব তথ্য ঠিকমতো না সংগ্রহ করে কোনও সিদ্ধান্তে আসা কী ভয়ানক বিপজ্জনক। ওইখানে বেদেদের আনাগোনা আর ওই 'ফেট্টি' শব্দটা আমাকে একদম ভুল দিকে নিয়ে যাচ্ছিল। তবে আমার বাহাদুরি এইটুকু যে, আমি সঙ্গে সঙ্গে ভুলটা বুঝতে পেরেছিলুম। আমি অকুস্থল পরীক্ষা করেই বুঝে নিয়েছিলুম যে, বিপদ বাইরে থেকে আসেনি। আমার নজর পড়ল ঘুলঘুলিটার দিকে, ওই ভুয়া ঘণ্টা-টানা দড়িটার দিকে, আর খাটটাকে ওই জায়গায় সেঁটে রাখার ব্যাপারটার দিকে। আমার তখুনি মনে হল যে, ওই দড়িটা ওখানে রাখা হয়েছে যাতে করে কোনও কিছু ওই ঘুলঘুলিটার ভেতর দিয়ে খাটের কাছে আসতে পারে। সাপের কথাটা আমার মাথায় তখনই

আসে। বিশেষত ডঃ রয়লট প্রায়ই ভারতবর্ষ থেকে জীবজন্তু আমদানি করেন, এ-কথাটাও আমার জানা ছিল। এই সাপে কামড়ালে বিষ খুব তাড়াতাড়ি কাজ করে। এটা ডঃ রয়লটের পক্ষে ভালই হয়েছিল। আর খুব ভাল করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে না দেখলে সাপে কামড়ানোর দুটো ছোট্ট ফুটো সহজেই নজর এড়িয়ে যেতে পারে। তখন আমি শিসের কথাটা ভাবলুম। শিস দিয়ে সাপটাকে ডেকে নেওয়া হত, যাতে করে ওই ঘরে যে রয়েছে সাপটাকে সে দেখতে না পায়। যে সময়টা উপযুক্ত বলে মনে হত, সেই সময়ে সাপটাকে ঘুলঘুলি দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হত। তারপর দড়ি বেয়ে সাপটা খাটের ওপর নেমে আসত। এখন এমন তো কোনও কথা নেই যে, বিছানায় যে শুয়ে থাকবে সাপটা প্রথম দিনেই তাকে কামড়াবে। হয়তো পর পর কয়েকদিনই কামড়াবে না। তবে এ-কথা ঠিক, এক দিন না একদিন সাপ কামড়াবেই।

"ডঃ গ্রিমসবি রয়লটের ঘরে পা দেবার আগেই আমি এই সিদ্ধান্তেএসেছিলুম। তারপর ওঁর ঘরে গিয়ে দেখলুম যে, উনি ওঁর চেয়ারটার ওপর প্রায়ই উঠে দাঁড়াতেন। তা তো দাঁড়াতেই হবে। তা না হলে উনি ঘুলঘুলির নাগাল পাবেন কী করে? তারপর সিন্দুকের ওপর দুধের ডিশ, আর ওই দড়ির ফাঁস দেখে আমি নিশ্চিত হলুম যে, আমার সিদ্ধান্ত ভুল হয়নি। তারপর আমি প্রমাণ সংগ্রহের জন্যে কী করলুম, তা তো তুমি জানোই। সাপটার হিসহিস শুনেই আমি আলো জ্বেলে ওটার ওপরে বেত মারতে লাগলুম।"

"আর তার ফলে ওটা আবার যে-পথে এসেছিল, সে-পথেই ফিরে গেল," আমি বললুম।

"হ্যাঁ। আমার বেতের ঘা খেয়ে সাপটা খেপে গিয়ে মালিককেই কামড়ে দিল। বোধহয় ডঃ রয়লটের মৃত্যুর জন্যে আমি কিছুটা দায়ী। তবে সত্যি কথা বলতে কী, তার জন্যে আমার একটুও অনুশোচনা হচ্ছে না।"

অনুবাদ : সুভদ্রকুমার সেন

ক্যাঙারু-শব্দ

ইংরেজি ভাষায় এমন কিছু-কিছু শব্দ আছে, যার মধ্যেই লুকিয়ে আছে সেই-সেই শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ। যেমন ধরো, 'curtail' শব্দটির মধ্যে লুকিয়ে আছে 'cut'। কিংবা 'respite' শব্দটির মধ্যে লুকিয়ে আছে 'rest'। চেষ্টা করলে নিশ্চয় এই রকমের আরও অনেক শব্দ তোমরা খুঁজে বার করতে পারবে।
মা-ক্যাঙারুর পেটের থলির মধ্যে যেমন লুকিয়ে থাকে বাচ্চা-ক্যাঙারু, এও তেমনি ব্যাপার। ইংরেজিতে তাই এই সব শব্দকে বলা হয় ক্যাঙারু-শব্দ।

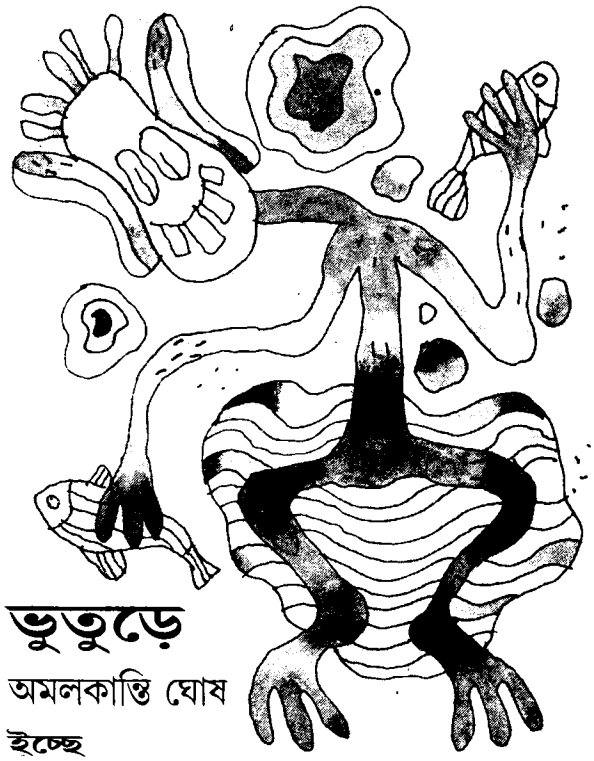

ভুতুড়ে

অমলকান্তি ঘোষ

ইচ্ছে

ইচ্ছে আছে, আবছা রাতে খামচি দিয়ে ধরব মাছ।
ইচ্ছে আছে, জলার ধারে কিনব বিশাল শ্যাওড়াগাছ।
কর্তা-গিন্নি আরাম করে,
দিন কাটাব এক কোটরে—
ডালপালাতে ভাড়াটে ভূত-প্রেতের সংখ্যা একশো পাঁচ।

ঠিকানা

কে কোথায় বাস করে, কার কোথা ডেরা?
—বড় ভূত পোড়ো-বাড়ি, ন্যাড়া ইটে ঘেরা।
হেঁজি ভূত ঝোপে-ঝাড়ে,
পেঁজি ভূত খালপাড়ে,
বিলিতি আমড়াগাছে সাহেবি ভূতেরা।

ছবি : দেবাশিস দেব

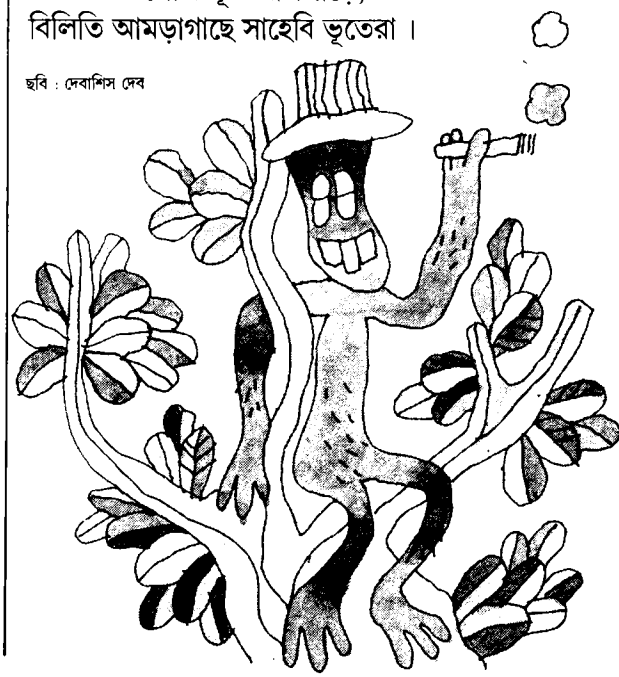

সুনির্মল বসু—চিরকালের কিশোরপ্রিয় লেখক

শুধু ছোটদের জন্য লেখাটাই যথেষ্ট নয়, যদি-না সে লেখা হয় ছোটদের উপভোগ্য। আমাদের সৌভাগ্য যে, কেউ-কেউ অন্তত এ-কথাটা বুঝতেন। বুঝতেন বলেই, তাঁদের লেখা সময়ের সীমা পেরিয়ে নিরন্তর আনন্দের চিরন্তন উৎস হয়ে থেকে গেছে। এমনই একজন চিরকালীন কিশোরপ্রিয় লেখক সুনির্মল বসু। তাঁর অজস্র রচনার সবটুকুই ছোটদের জন্য। তাদের মনের মতো করে লেখা। সহজ, স্বাদু, মজাদার। আনন্দ পাবলিশার্স থেকে প্রকশিত তাঁর চার-চারটি দুর্দান্ত গ্রন্থের একটিতে 'কানাকড়ি' নামের এক দীর্ঘ কাহিনী, সেইসঙ্গে চমৎকার একটি নাটিকা—'শহুরে মামা'। এটি তাঁর তিন খণ্ড রচনা-সম্ভারে নেই। গ্রামের দুই বিচ্ছু ছেলের হাতে শহুরে অহঙ্কারী মামার নাজেহাল হবার বৃত্তান্তে-ভরা এ-নাটক করতে যত মজা, পড়তে তার কম নয়। আরেকটি বই-'ছন্দের টুংটাং'। এতে সুনির্মল বসু শিখিয়েছেন কবিতা লেখার গোপন কথা। চোখে-দেখা আর কানে-শোনা চারপাশের সব-কিছুকে কী করে ধরা যায় সহজ ছন্দ-মিলে, তাই নিয়ে এই বই। আর দুটি আশ্চর্য বইতে বঙ্কিমচন্দ্রের ও মধুসূদনের ছোট্টবেলা থেকে শুরু করে সারা জীবনের নানান কাহিনী। এ-বই দুটিও বারবার পড়ার।

সুনির্মল বসুর বই

ছন্দের টুংটাং ৮·০০ বঙ্কিমচন্দ্র ৪·০০ মাইকেল মধুসূদন ৬·০০ শহুরে মামা ও কানাকড়ি ১০·০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা—৯

ডনের সঙ্গে আলাপ

সুজয় সোম

তখন হ্যামণ্ডের যুগ। উনিশশো আটাশ-উনত্রিশ সাল। ইংল্যাণ্ড গেছে অস্ট্রেলিয়া সফরে। নিউ সাউথ ওয়েলসের সঙ্গে খেলা। আগে ব্যাট করতে নেমে ইংরেজদের সাত উইকেটে ৭৩৪ রান উঠল। চতুর্থ জুটিতেই ৩৩৩ রান। প্যাটসি হেনড্রেন ১৬৭, ওয়াল্টার হ্যামণ্ড ২২৫।

দারুণ খেলছিলেন দুজনে। বাঘা-বাঘা বোলারদের তাচ্ছিল্য করে হুড়মুড়িয়ে রান বাড়ল। দাঁতে দাঁত চেপেও আটকানো গেল না। ওঁরা যেন অনন্তকাল খেলে যাবেন! হাল ছেড়ে দিলেন নিউ সাউথ ওয়েলসের খেলোয়াড়রা। মুচকি হেসে নিজেদের ব্যাটিংই বেজায় উপভোগ করতে লাগলেন ওয়ালি ও প্যাটসি।

হঠাৎ এক ছোকরা খেলোয়াড়ের হাতে বল তুলে দেওয়া হল। একরত্তি ছেলে। রোগা-পটকা, ছোটখাটো চেহারা। টেনেটুনে বছর কুড়ি বয়স। ছেলেটার মুখ গম্ভীর। দেখেই বোঝা গেল খানিকটা নার্ভাসও। হ্যামণ্ড বা হেনড্রেন ছেলেটাকে কোনও দিন দেখেননি। মনে রাখার মতো চেহারাও না।

নতুন বোলার, দুজনেই একটু গুটিয়ে নিলেন নিজেদের। বাড়াবাড়ি না করাই ভাল। অমন গোবেচারা, ভালমানুষ চেহারার আড়ালে মারাত্মক ছোবল থাকতেই পারে। আগে দেখা যাক। সাবধানে থেকে তিনটে ওভারে ১২ রান উঠল। না, এমন কিছু নয়। সাদা-মাটা বোলিং। ওয়ালির দিকে তাকিয়ে প্যাটসি মুখ বেঁকিয়ে হাসলেন, চোখ মটকালেন।

পরের ওভারের প্রথম বল পাঁই পাঁই করে পৌঁছে গেল মিড উইকেট বাউণ্ডারিতে। পরের বলটা ডিফেন্স নিলেন। তার পরের বল দুটো গিয়ে পড়ল লেডিজ স্ট্যাণ্ডে, রোমাঞ্চকর জোড়া ছক্কা! তার পরেরটাকেও একইভাবে পেটালেন প্যাটসি। কিন্তু কোথায় কী একটা গোলমাল হয়ে গেল! বলটা সটান ওপরে উঠে, নেমে এল ক্যাম্বেলের মুঠোয়। ব্যাট করতে এলেন মরিস লেল্যাণ্ড। শেষ বলটা ব্লক করলেন।

মাথায় খুন চেপে গেল ওয়ালির। ছোকরার পরের ওভারেই হেসেখেলে ২৪ রান। ফলে তাকে সরিয়ে দেওয়া হল মিড অফে ফিল্ডিং করতে। কেলেওয়ে বল করতে লাগলেন অন্য প্রান্ত থেকে। তাঁর একটা বল মিড অফে পাঠিয়ে রানের ডাক দিলেন মরিস। রানটা যে দিব্যি জুটে যাবে, এতটুকু সন্দেহ ছিল না। কিন্তু মিড অফের সেই ছেলেটা বল কুড়িয়ে নিয়েই ধাঁ করে ছুড়ে দিল উইকেটকিপার বার্ট ওল্ডফিল্ডের হাতে। ওয়ালি ক্রিজে পৌঁছাবার আগেই উইকেট ভেঙে চুরমার!

খচ্‌মচ্‌ করে প্যাভেলিয়নে ফিরে নিউ সাউথ ওয়েলসের এক কর্মকর্তাকে ওয়ালি শুধোলেন, "ছেলেটা কে মশাই? একেবারে বাঘের বাচ্চা। নজর রাখতে হবে।"

"আমাদের এক উঠতি প্লেয়ার। ডন ব্রাডম্যান।"

ডনের সঙ্গে ওয়ালির এই আলাপের জের অনেকদিন চলল। সার জন বেরি হবসের পরেই সেরা ইংরেজ ব্যাটসম্যান হিসেবে নাম-ডাক হওয়াতে, হ্যামণ্ড ভেবেছিলেন এবার আন্তর্জাতিক খেতাবটা মাথায় চড়াতে হবে। পৃথিবীর সেরা ব্যাটসম্যানের তুমুল স্বীকৃতি তিনি পেতেনও, যদি ডনসায়েব না থাকতেন!

ডাকাবুকো, তুখোড় ডানহাতি ব্যাটসম্যান ছিলেন ওয়ালি। একবার বিলেতের কাউণ্টি ক্রিকেটের খেলায় তিন ঘণ্টায় ১৮৭ রান তুলেছিলেন! বরাবরই অবিশ্যি দাপটের সঙ্গে ব্যাট করতেন। ক্রিকেটের ব্যাকরণ মেনে সহজ ও জোরালো স্ট্রোক প্লে। অসাধারণ কব্জির জোর। প্রথমবার অস্ট্রেলিয়া সফরেই, যেবার আলাপ হল ডনের সঙ্গে, গোটা সিরিজে রান তুলেছিলেন ৯০৫। গড়ে ১১৩·১২ রান। অনেকদিন পর্যন্ত তাঁর এই রেকর্ড ছুঁতে পারেননি কেউ। উনিশশো বত্রিশ-তেত্রিশ সালে নিউজিল্যাণ্ডে অকল্যাণ্ড টেস্টে তাঁর অপরাজিত ৩৩৬ রানের মেজাজি ইনিংস দেখে ক্রিকেট খেলার পাঠ নিয়েছিলেন কিশোর, তরুণেরা। কিম্বা আটত্রিশ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে লর্ডসে তাঁর সেই ২৪০ রানের অভিজাত, ধ্রুপদী ব্যাটিং? উনিশশো কুড়ি থেকে একান্ন, প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে তাঁর বত্রিশ বছরের কেরিয়ারে রান করেছেন ৫০,৪৯৩। গড়ে ৫৬·১০। এর মধ্যে একশো সাতষট্টিটা সেঞ্চুরি। পঁচাশিটা টেস্টে বাইশটা শতরান সমেত তাঁর রোজগার ৭,২৪৯ রান। গড় ৫৮·৪৫।

ওয়ালি ছিলেন রাগী মিডিয়াম ফাস্ট বোলারও। এবং চটপটে স্লিপ ফিল্ডার। তিরাশিটা টেস্ট উইকেটসুদ্ধু প্রথম শ্রেণীর ম্যাচে আদায় করেছেন সাতশো বত্রিশটা উইকেট। গড় যথাক্রমে ৩৭·৮০, ৩০·৫৮। প্রথম শ্রেণীর খেলায় ক্যাচ লুফেছেন ৮১৯টা। ১১০টা ক্যাচ টেস্টম্যাচে।

ডন ব্রাডম্যান

ওয়ালি হ্যামণ্ড

ফরাসি টেনিসে অভাবিত ফল

সম্রাট রায়

রীতিমতো অঘটনই বলতে হবে। কে আর ভেবেছিলেন, ফরাসি টেনিসে পুরুষ বিভাগে ম্যাটস উইল্যাণ্ডার শেষপর্যন্ত বিজয়ী হবেন। দু' কোটি ছিয়াশি লক্ষ টাকা মূল্যের ফরাসি টেনিসে সেমি-ফাইনাল পর্যন্ত হিসেবমতোই অঙ্ক মিলছিল। কারণ এক থেকে চার নম্বর বাছাই খেলোয়াড়রাই পৌঁছেছিলেন শেষ চার জনে। প্রথম সেমি-ফাইনালে গতবারের চ্যাম্পিয়ান এবং এবারের দু' নম্বর বাছাই চেকস্লোভাকিয়ার ইভান লেণ্ডল ৬-২, ৬-৩, ৬-১ গেমে হারিয়ে দিলেন তিন নম্বর বাছাই আমেরিকার জিমি কোনর্সকে। টেনিসে কোনর্স এক বিরাট প্রতিভা। বত্রিশ বছরের জীবনে নামী-দামি বহু টুর্নামেণ্ট জিতেছেন কোনর্স। কিন্তু খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার, ফরাসি ওপেনে তিনি কখনও চ্যাম্পিয়ান হতে পারেননি!

অন্য সেমি-ফাইনালে সুইডেনের ম্যাটস উইল্যাণ্ডারের বিপক্ষে আমেরিকার জন ম্যাকেনরো ছিলেন নিঃসন্দেহে ফেবারিট। কিন্তু গতবারের রানার্স এবং এবারের এক নম্বর বাছাই ম্যাকেনরোকে হতবাক করে উইল্যাণ্ডার ম্যাচ জিতে নেন ৬-১, ৭-৫, ৭-৫ গেমে। শেষ দুটি সেটে লড়াই করেও ম্যাকেনরো উইল্যাণ্ডারের আক্রমণাত্মক মেজাজে সামান্য নাড়াও দিতে পারেননি। হারের পরে কোনর্স ঠাণ্ডা লাগার অজুহাত খাড়া করার চেষ্টা করলেও ম্যাকেনরো হারের কোনও কৈফিয়তই দিতে পারেননি। কোনর্সের মতো জীবনে বহু কীর্তির অধিকারী হয়েও ফরাসি টেনিসের চ্যাম্পিয়ান-লিস্টে নিজের নাম তুলতে পারেননি ম্যাকেনরো, ভাবা যায়!.

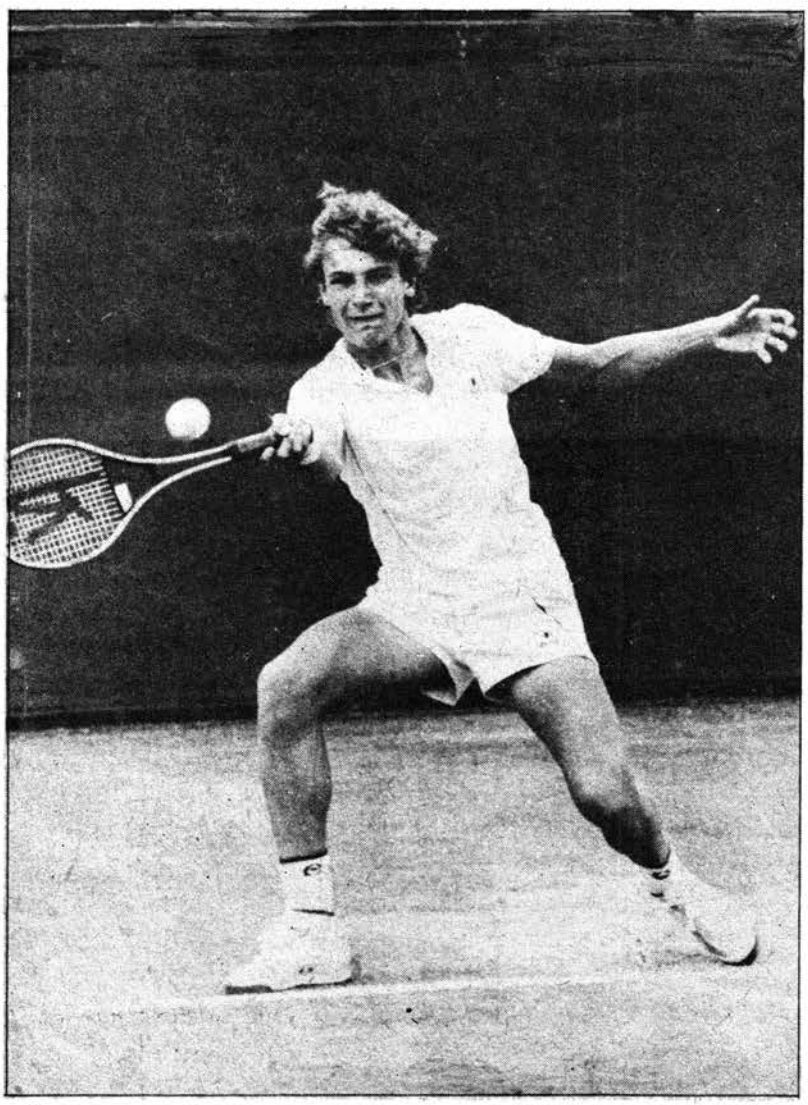

চ্যাম্পিয়ান ম্যাটস উইল্যাণ্ডার

ফাইনালে লেণ্ডলের জয় সম্পর্কে যাঁরা নিশ্চিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন অন্যতম ফাইনালিস্ট ম্যাটস উইল্যাণ্ডারও। খেলার শেষে নিজেই একথা কবুল করে উইল্যাণ্ডার বলেছেন, "কেউ ভাবেননি আমি জিতব। এমন কী আমি নিজেও ভাবিনি। তাই আমার মনের ওপর কোনওরকম চাপই ছিল না।" চাপমুক্ত মনে খেলা শুরু করে উইল্যাণ্ডার নাস্তানাবুদ করে তোলেন ক্লে-কোর্টের রাজা লেণ্ডলকে। বেস-লাইন থেকে যেভাবে তিনি নেটের কাছে মাঝে-মাঝেই ছুটে এসেছেন, তাতে বোঝা গেছে নিজের ওপর অগাধ আস্থা নিয়েই তিনি খেলছেন। শেষপর্যন্ত সেণ্টার-কোর্টের দর্শকদের অবাক করে উইল্যাণ্ডার ফরাসি খেতাব দ্বিতীয়বার জিতলেন ৩-৬, ৬-৪, ৬-২, ৬-২ গেমে।

মেয়েদের সিঙ্গলসের ফাইনালে অবশ্য যথারীতি মুখোমুখি হয়েছিলেন মার্টিনা নাভ্রাতিলোভা এবং ক্রিস এভার্ট লয়েড। কিন্তু মার্টিনার শক্তি এবং দাপটের বিরুদ্ধে অচঞ্চল ধৈর্য নিয়ে দুর্দান্ত টেনিস উপহার দিলেন ক্রিস। সেণ্টার-কোর্টের দর্শকরা মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখলেন ক্রিসের কুশলী পাসিং শটের নিখুঁত প্রয়োগ কীভাবে একটু একটু করে নিঃস্ব করে দিল নাভ্রাতিলোভার আত্মবিশ্বাস, শক্তি ও সম্ভাবনা। ক্রিস জিতলেন ৬-৩, ৬-৭, ৭-৫ গেমে। এই নিয়ে ছ'বার ফরাসি খেতাব জিতে ক্রিস স্পর্শ করলেন বিশের দশকে গড়া ফ্রান্সের সুজানে লেংলেনের রেকর্ড।

জুলাই একাদশ

অশোক রায়

কেউ-কেউ হয়তো বলবেন ব্যাপারটা নিতান্তই কাকতালীয়। কিন্তু মেনে নিতেই হবে ইদানীংকালের বেশিরভাগ নামী ক্রিকেটারের জন্মই জুলাই মাসে। এবং জুলাই-জাতক ক্রিকেটারদের নিয়ে এমন একটা ব্যালান্সড টিম তৈরি করা যায়, যাকে হারানো অন্য মাসের পক্ষে দুঃসাধ্য।

ইনিংসের শুরুতে যদি ভারতের সুনীল গাওস্কর এবং ইংল্যাণ্ডের গ্রাহাম গুচকে নামতে দেখা যায়, মনে হয় দর্শকরা একটু নিশ্চিন্ত হতে পারবেন। উপায় নেই বলেই পৃথিবীর অন্যতম

সুনীল গাওস্কর

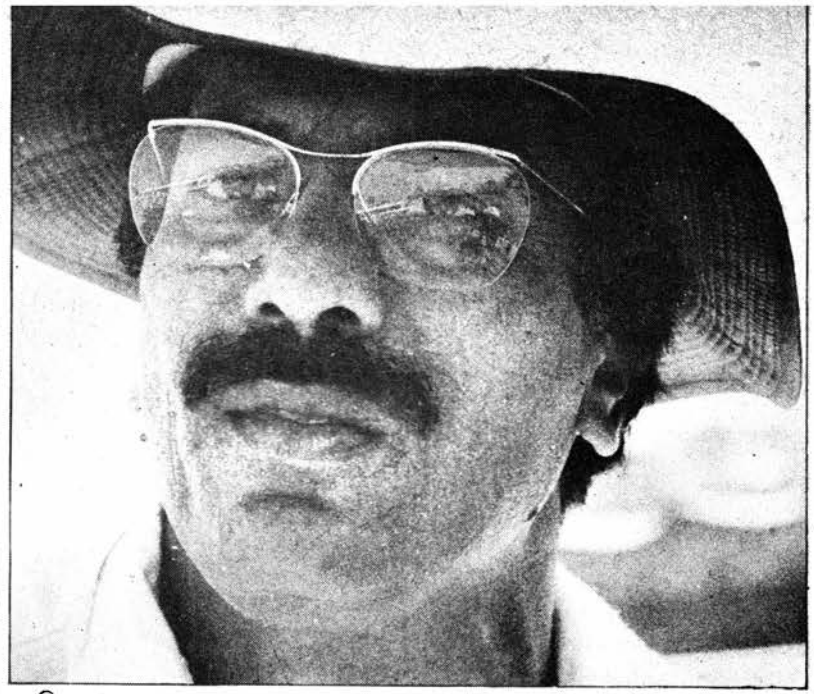

জাহির আব্বাস

শ্রেষ্ঠ ওপেনার দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যারি রিচার্ডস আসবেন ওয়ান-ডাউনে।

টু-ডাউনে যে-কোনও বিশ্ব একাদশেই পাকিস্তানের চশমাধারী ব্যাটসম্যান জাহির আব্বাসের নির্বাচন বাঁধা। তবে পাঁচ নম্বরে জোর লড়াই হবে বাঁ-হাতি ব্যাটসম্যান অ্যালান বর্ডার এবং পাকিস্তানের আর-এক বাঁ-হাতি ওয়াসিম রাজার মধ্যে। স্পেশালিস্ট ব্যাটসম্যান হিসেবে বর্ডার দলে ঢুকলে মনে হয় কোনও আপত্তি উঠবে না, কারণ এই মুহূর্তে বর্ডার রয়েছেন দুর্দান্ত ফর্মে। ছ' নম্বরে একজন অলরাউণ্ডারের কথা মাথায় রাখলে ভারতের রজার বিনিকে মনে পড়বে। বিশেষ করে গত প্রুডেনশিয়াল কাপ এবং রথম্যান্স ট্রফিতে বিনি দারুণ বল করেছেন। কিন্তু ওদিকে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ল্যারি গোমসও রয়েছেন ফর্মের তুঙ্গে। মিডিয়াম পেস বোলিংয়ের তেমন সুযোগ দেওয়া যাবে না বলেই ব্যাটিং-দক্ষতা বাড়াতে দলে থাকবেন গোমস।

সাত ও আট নম্বরে পৃথিবীর অন্যতম দুই সেরা অলরাউণ্ডারকে রাখা হবে। সাত নম্বরে আসবেন দক্ষিণ আফ্রিকার ক্লাইভ রাইস। অল্প কদিন আগে সেরা চৌকস ক্রিকেটারদের একক-আসরে বিজয়ী হয়েছেন রাইস। ওয়ান-চেঞ্জ বোলিংয়ের দায়িত্বও পালন করবেন তিনি। আট নম্বরে নিউজিল্যাণ্ডের ফাস্ট বোলার রিচার্ড হ্যাডলিকে বাদ দেওয়া অসম্ভব। নিউজিল্যাণ্ড-ক্রিকেটের যাবতীয় সুনামের পেছনে হ্যাডলির ভূমিকা বিরাট। সত্যি বলতে কি, আমরাও হ্যাডলিকে ভুলিনি। ১৯৭৫-৭৬ সিরিজে ওয়েলিংটনে এই হ্যাডলিই ভারতকে ধ্বংস করেছিলেন মাত্র ২৩ রানে ৭ উইকেট নিয়ে।

একটি টেস্টে দশটি ক্যাচ ধরার বিশ্বরেকর্ড সঙ্গে নিয়ে উইকেটের পেছনে দাঁড়াবেন ইংল্যাণ্ডের উইকেটকিপার বব টেলর। দশ নম্বরে ডেনিস লিলির ব্যাট দলকে খুব একটা রান দেবে না, তবে নতুন বলে বিপক্ষকে শুইয়ে দেবার কাজটি ভালই করবেন লিলি। টেস্টে হায়েস্ট উইকেট-টেকার ডেনিস কিথ লিলির বল হাতে দৌড়ের ভঙ্গি পৃথিবীর বহু ব্যাটসম্যানেরই রাতের ঘুম কেড়ে নেবে। স্পিনার একজন রাখতেই হবে। যদিও এই ব্যাপারটায় অস্ট্রেলিয়ার লেগ স্পিনার জিমি হিগসের নির্বাচন নিয়েই আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

হ্যাঁ, টিমের কোচ এবং ম্যানেজারের দায়িত্বে থাকবেন পৃথিবীর সর্বকালের সেরা অলরাউণ্ডার স্যার গ্যারি সোবার্স।

বেশ বোঝা যাচ্ছে, জুলাই মাসের টিম ঘোষিত হবার সঙ্গে সঙ্গে বহু মাথা ইতিমধ্যেই ক্রিকেটারদের ঠিকুজি জানতে উইজডেনের পাতায় ঝুঁকে পড়েছে। জুলাই একাদশের সঙ্গে ফাইট করতে পারে এমন দু-একটা টিম শেষ পর্যন্ত তৈরি হয় কি না সেটার অপেক্ষাতেই আপাতত থাকা যাক।

ভিভ যখন ভয়ানক

রাজা গুপ্ত

মাঝে-মাঝে কারা যেন বলেন ক্রিকেট বড্ড বোরিং খেলা। এই প্রচণ্ড গতির যুগে ক্রিকেটের ঠুক-ঠাক যেন গোরুর গাড়ির যুগকে মনে করিয়ে দেয়।

'এসব কথার উত্তর হয় না, হলেও আমার জানার মধ্যে পড়ে না। সুতরাং উত্তর খোঁজার চেষ্টা না করে বরং ভিভ রিচার্ডস নামক ভয়ংকর ঝড়টিকে একবার এদের সামনে হাজির করা যাক। ক্রিকেট কী পরিমাণ আনন্দ দিতে পারে সেটা ভয়ানক ভিভের ব্যাটিং থেকেই মালুম হবে।

ইদানীং ইংলিশ কাউন্টিতে প্রায় সব বোলারই ভিভের ব্যাটাঘাতে লাঞ্ছিত হচ্ছেন। উপায়ই বা কী বলো ? তোমরা তো জানো, ভিভ যেদিন মুডে থাকেন সেদিনটা আর কারুর নয়। ওয়ারউইকশায়ারের বিপক্ষে সেদিন সমারসেটের হয়ে ভিভ কী কাণ্ডটাই করলেন ! মাত্র ২৫৮ বলে, বিপক্ষ বোলিং চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ভিভ রান করলেন ৩২২। হ্যাঁ, একদিনেই। ভিভের এই অনবদ্য ইনিংসটিতে বোলারদের ওপর প্রভুত্ব বিস্তারের নমুনা হিসেবে ছিল আটটি ছক্কা ও বিয়াল্লিশটি চার। এক ইনিংসে মোট পঞ্চাশটি বাউণ্ডারি মারার কৃতিত্ব আর আছে মাত্র ন'জনের। ইংল্যাণ্ডের মাটিতে এইরকম সাংঘাতিক মেজাজি ব্যাটিং শেষবারের মতো পাওয়া গিয়েছিল মিডলসেক্সের জ্যাক্ রবার্টসনের কাছ থেকে ছত্রিশ বছর আগে। উরস্টার্সের বিপক্ষে রবার্টসন একদিনেই হাঁকিয়েছিলেন ৩৩১ রান। এই অবিশ্বাস্য ইনিংসের সুবাদে রিচার্ডস একাধিক রেকর্ড গড়লেন। এতদিন সমারসেটের পক্ষে সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড ছিল হ্যারল্ড গিমলেটের (৩১০)। রিচার্ডস রেকর্ড-বুক থেকে সরিয়ে দিলেন গিমলেটকে। এর আগে প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে রিচার্ডসের সবচেয়ে বড় রান ছিল ১৯৭৬ সালে ওভালে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ২৯১। ভিভ অতিক্রম করে গেলেন নিজেকে। সবচেয়ে বড় ঘটনা, একদিনে তিনশো রান করার ক্ষেত্রে তিনিই হলেন প্রথম ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান।

একদিনে তিনশো রানের ঝড় তোলার আরামদায়ক খবর খুঁজতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে, এর আগে আরও পনেরো জনের কব্জায় রয়েছে এই দুর্ধর্ষ কৃতিত্ব। কাউন্টিতে শেষবারের মতো একদিনে তিনশো রান করার গৌরব জমা রয়েছে নিউজিল্যাণ্ডের গ্লেন টার্নারের নামের পাশে। ১৯৮২ সালে টার্নার সংগ্রহ করেছিলেন ৩১১ রান ওয়ারউইকশায়ারের বিরুদ্ধে।

একদিনে সর্বাধিক রান করার অবিশ্বাস্য কৃতিত্ব অবশ্য অস্ট্রেলিয়ার চার্লস ম্যাকারটনির। অবিশ্বাস্য, কারণ নটিংহামের বিপক্ষে এই রেকর্ড গড়ার জন্যে তিনি ব্যয় করেছিলেন মাত্র ২৩৫ মিনিট ! টেস্ট ক্রিকেটে একদিনে তিনশো রানের একমাত্র রেকর্ডটি রয়েছে এক এবং অদ্বিতীয় ডন ব্রাডম্যানের দখলে। ১৯৩০ সালে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে লিডসে একদিনে ডন করেছিলেন ৩০৯ রান। ১৯৩০ সালটা অবশ্য আমরা ভারতীয়রাও মনে রাখব। সাসেক্সের পক্ষে ভারতীয় ব্যাটসম্যান দলীপ সিংজি নর্দাম্পটনের বিপক্ষে খেলেছিলেন ৩৩৩ রানের এক মনোরম ইনিংস।

‘চিমা’ এখন চোখের মণি

নৃপতি চৌধুরী

গায়ের রং কুচকুচে কালো। মাথায় ঘন কোঁকড়া চুল। গালও ছেয়ে আছে দাড়িতে। মর্নিং প্র্যাকটিস শেষ করার পরে ছেলেটি আমার সামনে খালি গায়ে দাঁড়িয়ে হাঁফাচ্ছিল। কালো পাথরের মতো ওর বিরাট পেশীবহুল বুকের ওঠা-পড়ার দিকে তাকিয়ে নতুন করে বুঝতে পারছিলাম, কেন বলা হয়, স্বাস্থ্যই সৌন্দর্য। নাম ওকোরি চিমা, নাইজিরিয়ার ছেলে। কলকাতার লিগ ফুটবলে মহমেডানের জার্সি গায়ে চড়িয়ে মাঠে নামবে বলে একেবারে তৈরি হয়ে রয়েছে। মহমেডানের পক্ষে চিমা ওয়ালটেয়ারে শুধু দারুণ খেলেছে বললে কম বলা হবে। তিন ম্যাচে চার গোল দিয়ে দলকে সে প্রায় একাই জিতিয়ে এনেছে বিশাখা ট্রফিতে। এই বছর জামশিদ নাসিরিকে হারিয়ে মহমেডানের সমর্থকরা ঠিক যতটা দুঃখিত হয়েছিল, চিমাকে দলে পেয়ে তারা ঠিক ততটাই খুশি। গ্যালারিতে এখন যে-নামটা সকলের ঠোঁটে ঘুরছে, সেটা বলা বাহুল্য, চিমার।

খুব পরিশ্রান্ত থাকা সত্ত্বেও চিমাকে যখন বললাম, আমি ‘আনন্দমেলা’র বন্ধুদের কাছ থেকে এসেছি, কী আশ্চর্য একটাও পাল্টা প্রশ্ন না করে চিমা আমার পাশে বসে পড়ল চেয়ার টেনে। তারপর গমগমে গলায়, ভাঙা-ভাঙা ইংরেজিতে বলল, “বলো কী তোমার প্রশ্ন?” বলা বাহুল্য, এরপরে চিমার সঙ্গে জমে যেতে হল প্রায় ঘণ্টা দেড়েক।

চিমার ওজন পঁচাত্তর কেজি। হাইট ছ’ ফুট। যখন হাসে, তখন টেন্ট গমগম্ করে ওঠে। চিমারা দুই ভাই, দুই বোন। চিমা ভাইদের মধ্যে বড়। ফুটবলে চিমার মাতামাতি শুরু বছর আট-নয় থেকে। বাবা যদিও ইউনিভার্সিটি লেভেলে ফুটবল খেলেছেন, তবু খেলার চেয়ে চিমার পড়াশুনোর উপরই বাবা বেশি নজর রাখতেন।

পড়াশুনো এবং খেলা দুটোই

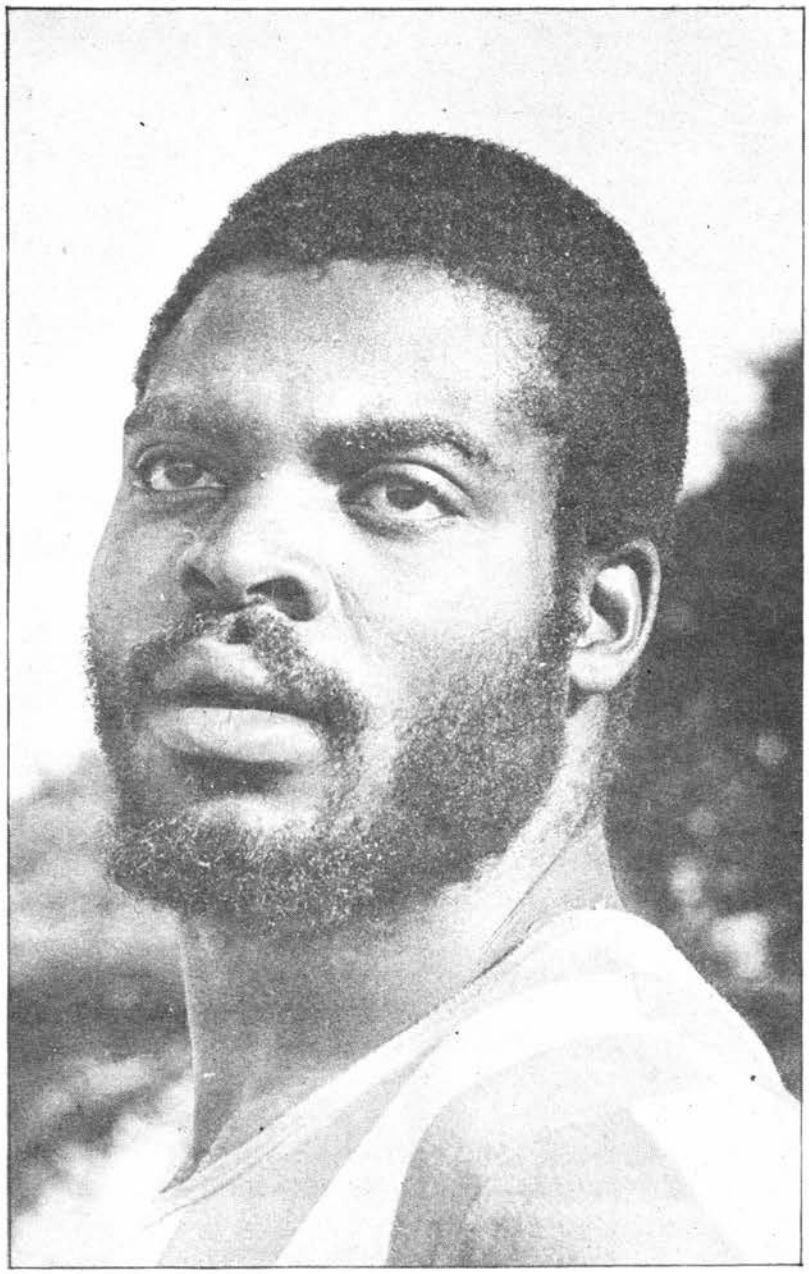

মহমেডানের নতুন ফুটবল-তারকা চিমা

চালিয়েছে চিমা। তিরাশির মে মাসে মাত্র কুড়ি বছর বয়সে নাইজিরিয়ার জাতীয় জুনিয়র দলের সঙ্গে মেক্সিকো গিয়েছিল। সেখানে হেরে যায় ব্রাজিলের কাছে। দু’মাস পরেই চিমা পড়তে চলে আসে ভারতে। খবর রটে যায় যে, চিমার মধ্যে ফুটবল ব্যাপারটা আছে। ধারণাটা দৃঢ় হয় পরের বছর, যখন ও রোভার্সে হায়দরাবাদের হয়ে দারুণ খেলে। খবর চলে আসে মহমেডানের কাছেও। জামশিদ নাসিরি ইস্টবেঙ্গলে সই করার পর থেকেই মহমেডান চিন্তিত ছিল ফরোয়ার্ড-লাইন নিয়ে। চিমাকে পেয়ে লুফে নেয় তারা। ফেডারেশান কাপে চিমাকে খেলানো যায়নি। ওয়ালটেয়ারে বিশাখা ট্রফিতে চিমা প্রথম খেলল মহমেডানের হয়ে। এবং তিনটি ম্যাচে চারটে গোল করে হিরো বনে গেল। ট্রফি জিতে কলকাতায় ফেরার পর থেকে মহমেডান সমর্থকরা প্রতিদিন হুড়মুড় করে ছুটছেন মাঠে। না, প্র্যাকটিস দেখতে নয়, চিমাকে দেখতে।

বর্ষার মাঠে চিমা কতটা সফল হয়, সেটাই এখন দেখার।

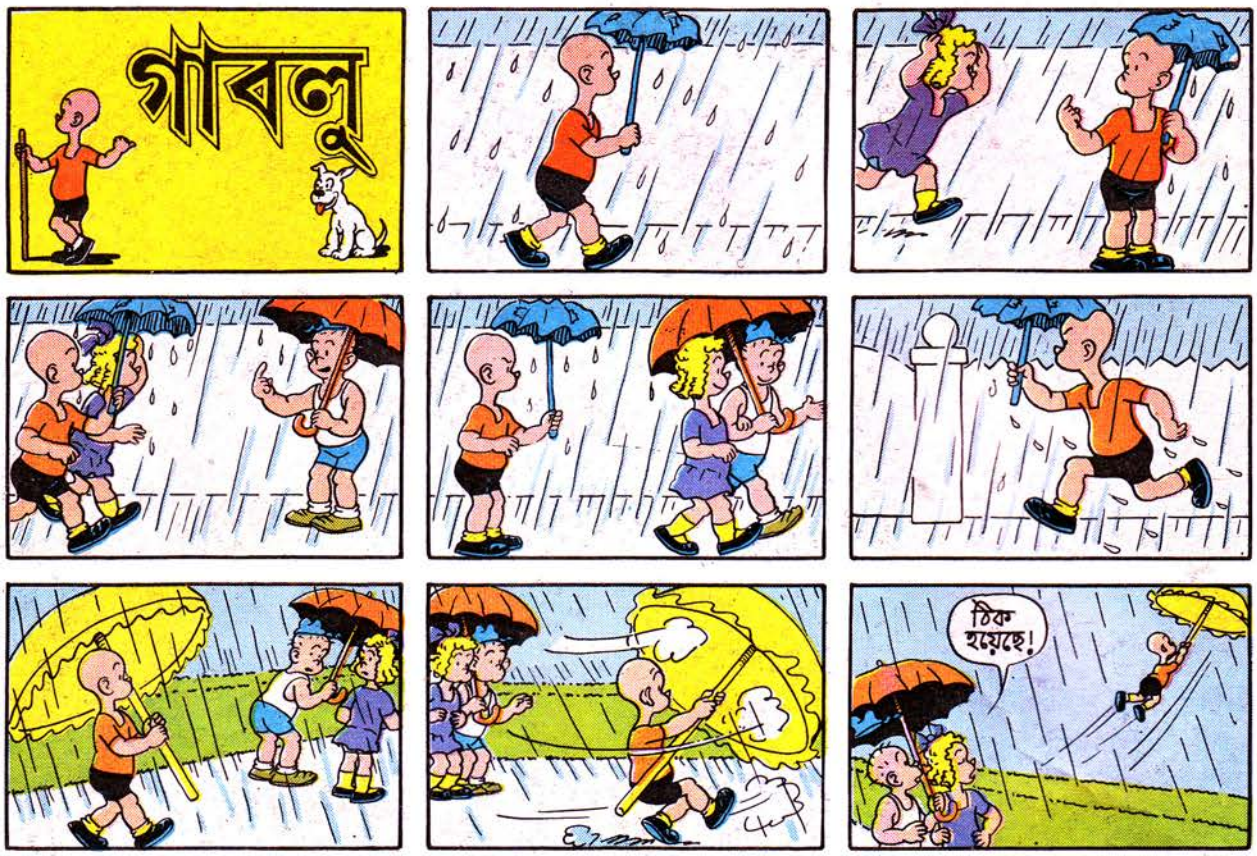
গাবলু
ঠিক হয়েছে!

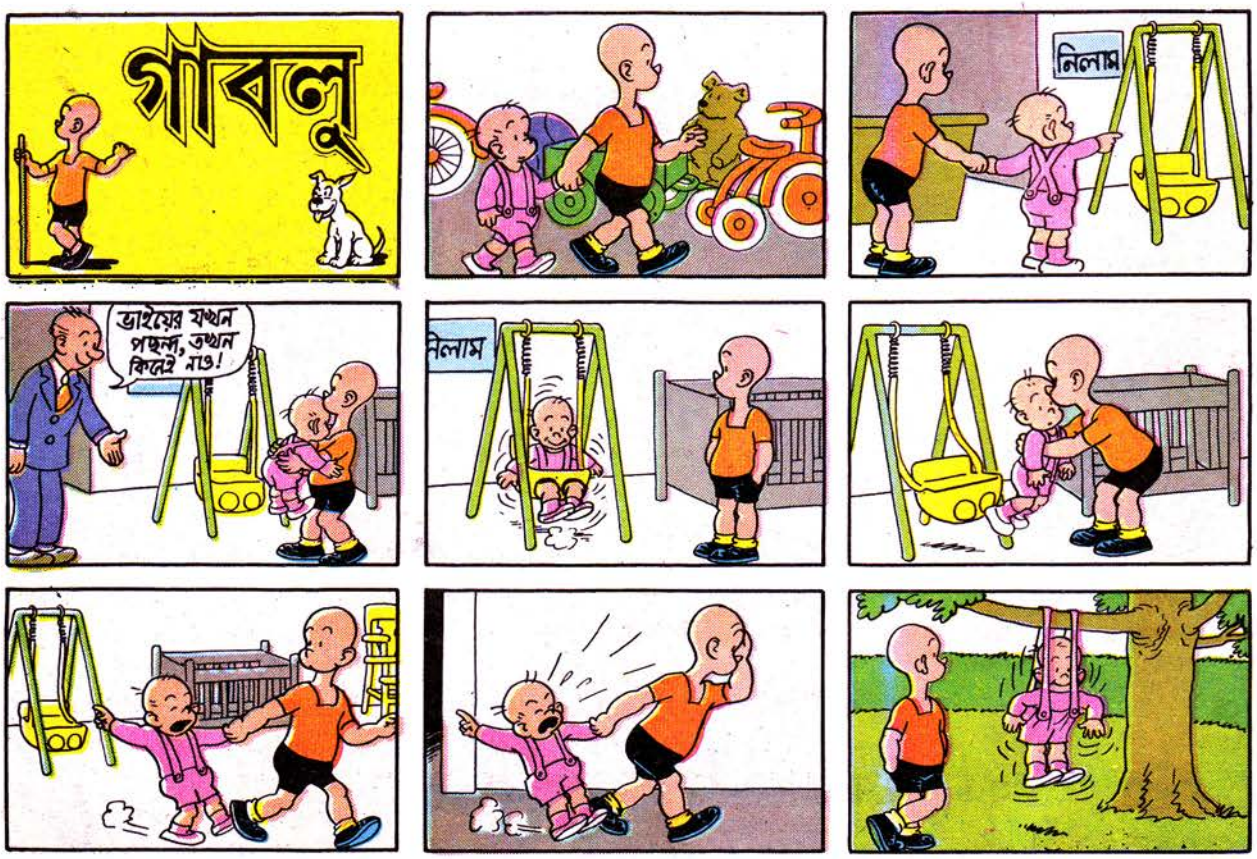
গাবলু
নিলাম
ভাইয়ের যখন পছন্দ, তখন কিনেই নাও!
নিলাম

এর মধ্যে কোন কেয়ো-কার্পিন চুলটি আপনার ?

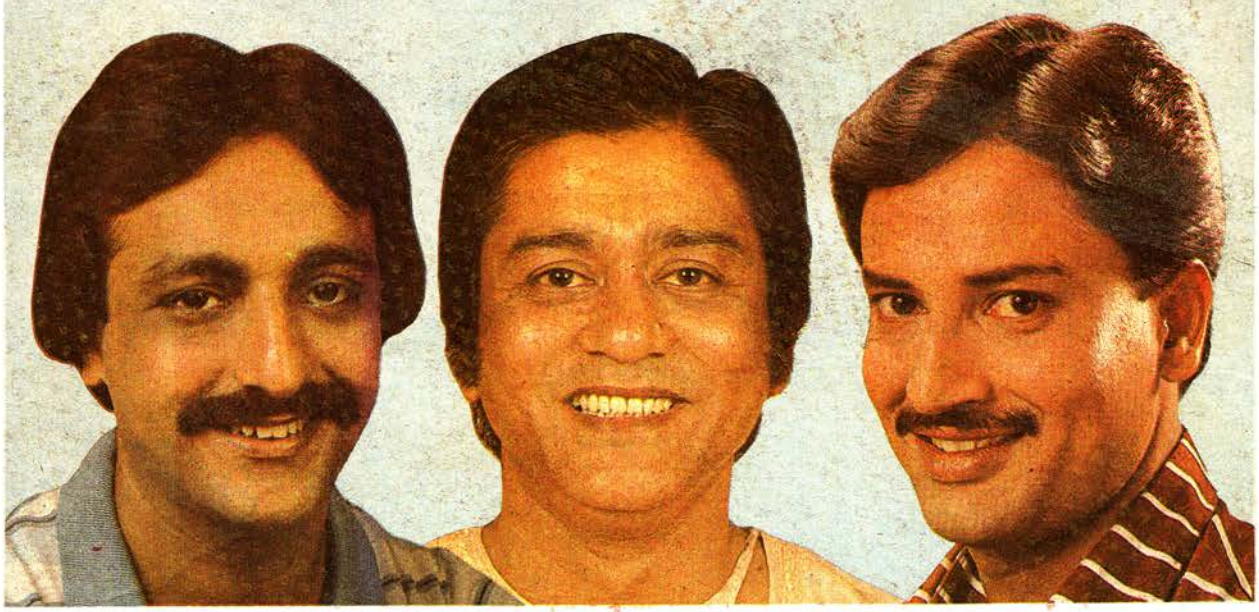

চুল যেমনই হোক না কেন,
কেয়ো-কার্পিন হেয়ার অয়েল কিন্তু
আপনারই জন্যে । কারণ, এতে
চুল থাকে পরিপাটি,
স্বাস্থ্যোজ্জ্বল । অথচ মাথায়
তেলমাখা, চটচটে
বিসদৃশ ভাবটি থাকে না ।

যে কোন ধাঁচে, যে কোন
স্টাইলে এ চুল

আপনি আঁচড়াতে পারেন ।

রোজ ব্যবহার করুন সুগন্ধী
কেয়ো-কার্পিন হেয়ার অয়েল ।
চুল থাকবে সুন্দর,
স্বাস্থ্যোজ্জ্বল । এবার চাইলে
নিজের ইচ্ছেমত চুলের স্টাইল
পাল্টে পাল্টে দেখুন
কোনটিতে আপনাকে সবথেকে
বেশী ভালো মানায় ।

কেয়ো-কার্পিন

সুগন্ধী হেয়ার অয়েল

আপনার চুল সুস্থ ও সুন্দর রাখে অথচ চটচটে করে না

১০০ এবং ৩০০ মি.লি. শিশিতে পাওয়া যায়

Dey's® যাদের যত্নই আপনার আস্থা

CLARION C DMHO-3R

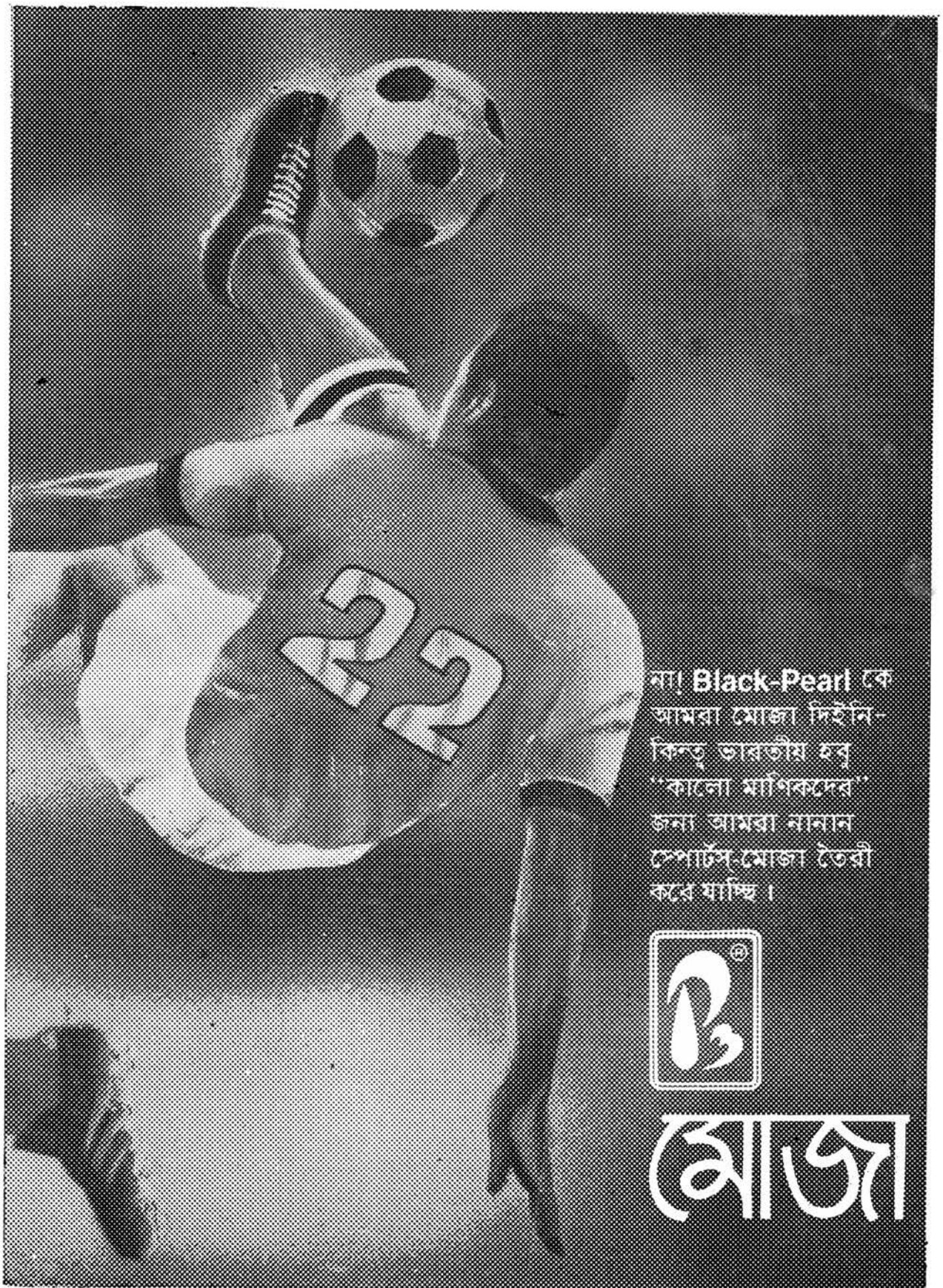
না! Black-Pearl কে
আমরা মোজা দিইনি-
কিন্তু ভারতীয় হরু
"কালো মাণিকদের"
জন্য আমরা নানান
স্পোর্টস্-মোজা তৈরী
করে যাচ্ছি।
মোজা

PAD/P3/31/85

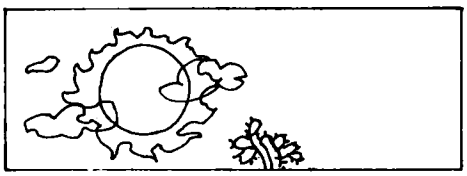

গ্রীষ্ম-বর্ষা

সাধনা মুখোপাধ্যায়

মানুষ তার হিসেবের সুবিধে অনুযায়ী বছরটাকে ছয় ঋতুতে ভাগ করেছে—গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত । সাধারণত একেকটি ঋতুর এলাকায় আছে দুটি করে মাস। সেই হিসেব অনুযায়ী বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ এই দুটি মাস হল গ্রীষ্মকাল এবং আষাঢ় শ্রাবণ এই দুটি মাস হল বর্ষাকাল।

কিন্তু মানুষের সুবিধের মুখ চেয়ে তো প্রকৃতিদেবী চলেন না। সেইজন্যে বসন্তের সময় ফুরোবার আগেই গ্রীষ্ম এসে তার রাজ্যপাটে ঢুকে পড়ে। চৈত্র মাস থেকেই আমাদের মনে হয়, বসন্ত নয়, গ্রীষ্মের শাসন চলছে। ওদিকে বর্ষাও আষাঢ় শ্রাবণ এই দুটো মাসের চৌহদ্দি ছাড়িয়ে ভাদ্রের এলাকায় হানা দেয়। তাই এ-কথা বলা যায় যে, কোনও ঋতুকেই কোনও নির্দিষ্ট মাসের ঘেরাটোপে ঠিক-ঠিক বেঁধে রাখা যায় না, যেমন বাঁধা যায় না যে-কোনও ঋতুতে আকাশে ভাসমান লঘুভার মেঘকে।

জলবায়ুর অবস্থাভেদে বছরকে নানান ঋতুতে ভাগ করা হয়েছে। মানুষের মেরুদণ্ড যেমন শরীরের মাঝখান দিয়ে গেছে, পৃথিবীরও সেইরকমই একটা মেরুদণ্ড আছে। পৃথিবীর এই যে মেরুদণ্ড, এটা কাল্পনিক। একে বলা হয় 'অক্ষ'। আমাদের মেরুদণ্ড যেমন আকাশের দিকে সর্বদা খাড়া হয়ে রয়েছে, পৃথিবীর অক্ষ কিন্তু ঠিক যে-রকমটা নয়। পৃথিবী যে পথের ওপর দিয়ে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে, তাকে বলা হয় কক্ষতল। এই কক্ষতলের উপর পৃথিবীর অক্ষ সর্বদা ধ্রুব নক্ষত্রের দিকে মুখ করে ৬৬$^{১}/_{২}^{\circ}$ কোণ করে হেলে রয়েছে। এইভাবেই পৃথিবী নিজের অক্ষের ওপর পাক দেয় প্রায় ২৪ ঘণ্টায় একবার করে, আর এইভাবেই রাত-দিনের সৃষ্টি হয়। অক্ষের উপর পাক দিতে-দিতে সূর্যকে একবার ঘুরে আসতে প্রায় ৩৬৫$^{১}/_{৪}$ দিন লেগে যায়। তাকেই আমরা বলি বছর।

দিনের দৈর্ঘ্য এবং সূর্য কতটা লম্বভাবে কিরণ দিচ্ছে তার ওপরই নির্ভর করে ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা। বছরের বিভিন্ন সময়ে সূর্য নিরক্ষরেখার প্রায় ২৩$^{১}/_{২}^{\circ}$ উত্তরে কর্কটক্রান্তি ও নিরক্ষরেখার প্রায় ২৩$^{১}/_{২}^{\circ}$ দক্ষিণে মকরক্রান্তি—এই এলাকার মধ্যে লম্বভাবে কিরণ দেয়। দিনের বেলায় পৃথিবী সূর্যের যতটা তাপগ্রহণ করে, রাত্রিতে সেটা বিকিরণ করে ঠাণ্ডা হয়ে যায়। দিনের বেলায় যে তাপটুকু জমা হয়েছিল, রাত্রিতে যদি তা বিকিরণ করতে না পারে, তা হলে গরম ক্রমশ বাড়তে থাকে, আর এইভাবেই শুরু হয়ে যায় গ্রীষ্মকাল। ২১ মার্চ হয়

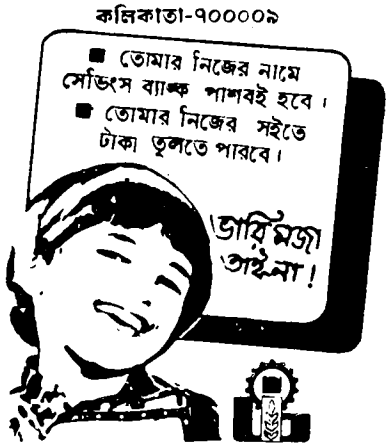

তোমাদের জন্য এখন আমাদের পাঁচ-পাঁচটি
চিলড্রেন্স কাউণ্টার
রিচি রোড শাখা
১৭/২, রিচি রোড, কলিকাতা-৭০০০১৯
গড়িয়াহাট শাখা
১এ, ম্যাণ্ডেভিলা গার্ডেনস
কলিকাতা-৭০০০১৯
(প্রবেশপথ গড়িয়াহাট রোড)
সন্তোষপুর শাখা
১১৭, সন্তোষপুর অ্যাভেনু
কলিকাতা-৭০০০৭৫
সল্টলেক সিটি
বিধাননগর শাখা
বিডি-৯৮, সল্ট লেক সিটি
কলিকাতা-৭০০০৬৪
কলেজ স্ট্রীট শাখা
৬১, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৭০০০০৯

ইউনাইটেড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড
সেণ্ট্রাল অফিস :
"পার্ক সেণ্টার" ২৪ পার্ক স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০১৬
হেড অফিস :
১৭, আর এন মুখার্জী রোড
কলিকাতা-৭০০ ০০১
রেজিঃ অফিস :
৭, রেড ক্রস প্লেস
কলিকাতা-৭০০ ০০১
Progressive UIB-7/85

মহাবিষুব। এই দিনে সূর্য ঠিক বিষুবরেখার ওপর লম্বভাবে কিরণ দেয়, কাজেই যারা পৃথিবীতে এই তারিখে রাতদিন ঠিক সমান-সমান হয়। অর্থাৎ বারো ঘণ্টা রাত, আর বারো ঘণ্টা দিন। তারপরেই উত্তর গোলার্ধে দিন ক্রমশ বড় হতে থাকে, আর রাত হয় ছোট। সূর্যদেবের দেখা পাওয়া যায় তাড়াতাড়ি, আর তিনি অস্তও যান দেরিতে। এইভাবেই পৃথিবীর মাটির ভাঁড়ারে দিনের বেলার তাপ জমতে থাকে, এইভাবেই ক্রমশ আমাদের দেশে গ্রীষ্মকাল এসে পড়ে।

যদিও চৈত্র মাস বসন্তের এলাকার মধ্যেই পড়ে, তবুও চৈত্র মাসের নির্মেঘ আকাশের জ্বলন্ত দুপুরগুলো বেশ গরম। প্রচণ্ড রোদ্দুর উঠলে আর দিনের তাপ খুব বেড়ে গেলে বিকেলের দিকে মাঝে-মাঝে ঝড় ওঠে, দু-এক পশলা বৃষ্টিও হয়ে যায়। সন্ধেবেলার দিকে অবশ্য একটা গা-জুড়োনো ফুরফুরে হাওয়া বয় দক্ষিণ অর্থাৎ বঙ্গোপসাগর থেকে। বছর শেষ হয়ে আসে। গাছের পাতা সব ঝরে যায়। ধুলোর সঙ্গে উড়তে থাকে সেই সব শুকনো ঝরাপাতা। রাস্তায় গলতে থাকে পিচ।

ক্রমশ আসে বৈশাখ মাস, নতুন বছর। আস্তে-আস্তে গরম আরও বাড়তে থাকে। সাড়ে পাঁচটা বাজবার আগে সূর্যদেব উঠে পড়েন। ছ'টার সময় তো রীতিমত আলো। দিনের চড়া রোদে সব গাছপালাই তখন নতুন পাতার সাজপোশাক পরে

ঝলমল করছে। ফুল ধরেছে অনেক গাছেই। তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি ফুল ধরেছে কৃষ্ণচূড়ায়। ছাতের ছোট টবে ফুটেছে বেলফুল।

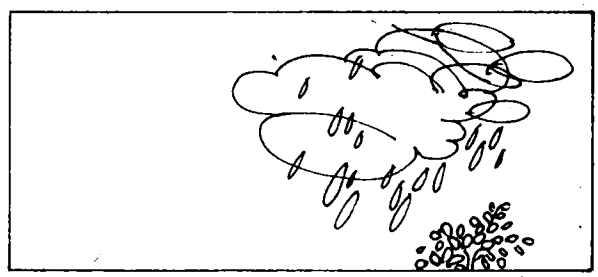

দুপুরের রোদ্দুরে হঠাৎ কখনও কখনও ভেসে আসে দস্যুর মতো কালো মেঘ। বিকেলের দিকে সূর্যকে ঢেকে ফেলে সে কী তুলকালাম কাণ্ড। প্রথমে শোঁ শোঁ করে ধুলোর ঝড় বইতে থাকে—তারপরই শুরু হয় কড় কড় কড়াত করে বাজ পড়ার শব্দ, মেঘের বুক চিরে ডাইনির জিভের মতো লক্‌লক্‌ করে বিদ্যুৎ চমকায় আর তার সঙ্গে নামে তুমুল বৃষ্টি। এই সময় নতুন ফলের মধ্যে আছে তরমুজ, তালশাঁস আর জিভে-জল-আনা কাঁচা আম।

এরপরে জ্যৈষ্ঠে গরম ক্রমশ বাড়তেই থাকে। স্কুলে-স্কুলে গরমের ছুটি আরম্ভ হয়ে যায়। প্রাণটা যেন গরমে আনচান আনচান করে, পড়তে বসতেও ইচ্ছে করে না। দুপুরবেলায় ঘরে বসে লুডো, সাপলুডো, ক্যারাম, চাইনিজ চেকার, ওয়ার্ড মেকিং-এর আসর জমে ওঠে। দিনটা কী ভীষণ বড় হয়ে গেছে, বেলা যেন আর ফুরোতেই চায় না। গ্রামে বা মফস্বলে দেখা যায় গাছে-গাছে কাঁঠালের কী সমারোহ! গাছের আমগুলোয় আস্তে আস্তে পাক ধরছে। বাজারে উঠেছে লিচু, জামরুল, বড় বড় বেল। জ্যৈষ্ঠ তো ফলেরই মাস। জ্যৈষ্ঠের

গরমে আমাদের কষ্ট হয় বটে, কিন্তু এই গরমই তো ফলকে পাকায়।

মোটামুটি এই তো হল গ্রীষ্মকালের তিনটি মাস। গরম যতই বাড়তে থাকে, স্কুলে যাওয়া-আসার পথে বা খেলার মাঠে খেলাধুলো করে ততই তৃষ্ণা বাড়তে থাকে। এই সময়ে আইঢাই গরমে কুলফি, আইসক্রিম, এই সব ঠাণ্ডা খাবার খাওয়ার দিকে ঝোঁকও বেড়ে যায়। তৃষ্ণা নিবারণ করবার জন্যে বা ঠাণ্ডা খাওয়ার ইচ্ছে মেটাবার জন্যে পথে-ঘাটে উপকরণের অভাব থাকে না। চাকাওয়ালা গাড়িতে রঙিন সিরাপের বোতল সাজিয়ে শরবতওয়ালা ঘুরতে থাকে। খ্যাত-অখ্যাত কোম্পানির আইসক্রিমের গাড়ি হাজির থাকে স্কুলের দোরগোড়ায় বা খেলার মাঠের পাশেই। কিন্তু শরবত খেতে হলে নামী কোম্পানির ভাল সিরাপ কিনে বাড়িতে তৈরি করে খাওয়াই ভাল। আজকাল শরবতের জন্যে অনেক রকম ড্রিংক কনসেনট্রেট পাওয়া যায়, যেগুলো এক প্যাকেট কিনে চিনি ও জল মেশালে অনেক গেলাস ভাল শরবত তৈরি হয়ে যায়। এছাড়াও আছে বোতলে ভরা নানান ধরনের পানীয়। এই সব পানীয় কিনতে হলে নামী ও ভাল কোম্পানির পানীয় কেনাই ভাল। দেখে নিতে হবে বোতলে ঠিক ঠিক লেবেল লাগানো আছে কি না এবং সিল করা আছে কি না। তৃষ্ণা নিবারণের জন্যে এই সব পানীয় খাওয়াই নিরাপদ।

আইসক্রিমের বেলাতেও সেই কথাই খাটে। নামী কোম্পানির আইসক্রিম খাওয়াই ভাল, এগুলি স্বাস্থ্যসম্মতভাবে তৈরি হয়। সেইজন্যে এই সব আইসক্রিম খেলে স্বাস্থ্যের তো ক্ষতি হয়ই না, বরঞ্চ শরীরের পুষ্টি হয়।

আইসক্রিম শরবত ইত্যাদির ব্যাপারে আরেকটা কথা বলা যায়। বাড়িতে একটা ফ্রিজ থাকলে বাড়িতেই আইসক্রিম কুলফি এই সব সহজেই বানানো যায়—পাওয়া যায় তৃষ্ণা নিবারণের জন্যে অঢেল ঠাণ্ডা জল, শরবত পানীয় ইত্যাদি ঠাণ্ডা করবার জন্যে বরফ। গরমকালে খাবার-দাবার তাড়াতাড়ি পচে যায়, শাক-সবজি ফল ইত্যাদি কিনে রাখলে

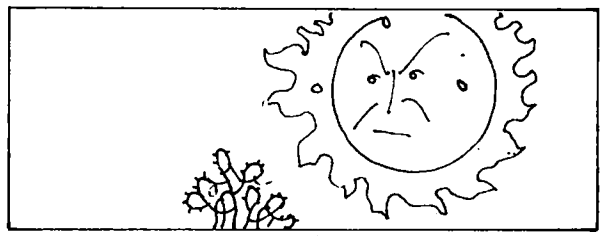

শুকিয়ে যায়। ফ্রিজ থাকলে বাড়তি খাবার দাবারও নষ্ট হবে না এবং শাক-সবজি ফলও কয়েকদিন পর্যন্ত টাটকা থাকবে।

একেবারে গোড়ার কথাটাই তো বলা হয়নি। গ্রীষ্মকালে গরমের হাত থেকে রেহাই পেতে হলে প্রথমেই চাই পাখা। হাত-পাখা টানা-পাখার যুগ তো কবেই শেষ হয়ে গেছে, এখন চাই বিজলি-চালিত পাখা, যাকে ইংরিজিতে বলা হয় ফ্যান। এখন তো ফ্যানের রাজত্বে বৈচিত্র্যের শেষ নেই। আছে সিলিং ফ্যান, টেবিল ফ্যান, পেডেস্টাল ফ্যান, অসিলেটিং বা

ঘুরে-ঘুরে হাওয়া দেওয়া ফ্যান, ওয়াল ফ্যান, কেবিন ফ্যান। গরমের জুজুটাকে কুপোকাত করতে হলে ফ্যানই হল সবচেয়ে সহজ ও সুলভ হাতিয়ার। রোদ্দুর থেকে বাড়ি এসে ফুল স্পিডে ফ্যান না চালিয়ে বসলে আর স্বস্তি কোথায়।

গ্রীষ্মের পরেই এসে পড়ে বর্ষা। সত্যি কথা বলতে কী, গ্রীষ্মকেই বলা যায় বর্ষার অগ্রদূত। একনাগাড়ে গ্রীষ্ম চললে ভূমি দারুণভাবে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ; সেখানে নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়। হাওয়া হালকা হয়ে ওপরে উঠে যেতে থাকে। সেই

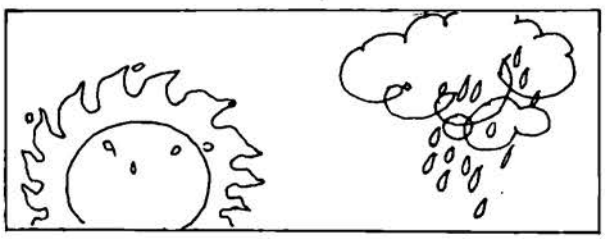

শূন্যস্থান পূর্ণ করবার জন্যে সমুদ্র থেকে জলীয়বাষ্প, পূর্ণ দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু ছুটে আসে। আষাঢ়, শ্রাবণ এবং কখনও-কখনও ভাদ্রমাসেও বৃষ্টিপাত ঘটায়। আষাঢ় মাসে আকাশের মুখটা যেন থমথম করে ওঠে বৃষ্টি-ভরা কালো মেঘের ভারে। দীর্ঘদিন গরমের পরে মেঘ বৃষ্টি আর তার সঙ্গে মাটির সোঁদা-সোঁদা গন্ধ ভালই লাগে, ভালই লাগে নতুন বর্ষার বৃষ্টিতে ভিজতে, আর খিচুড়ি, গরম-গরম মাছ-ভাজা ও পাঁপড়-ভাজা খেতে। রাস্তার মোড়ে দাঁড়ানো জামওয়ালার কাছ থেকে জাম কিনে নুন মাখিয়ে খেতেও মন্দ লাগে না। গাছ-গাছালির ধুলোমাখা পাতাগুলো নতুন বৃষ্টির জলে স্নান করে ধুয়ে মুছে তখন একেবারে ফিটফাট।

আষাঢ়ের পরে আসে শ্রাবণ। একটানা বৃষ্টির মধ্যে মধ্যে আসে দু-একটা রোদ্দুরে ঝলমল দিন। কিন্তু শীতের রোদ্দুরের মতো এ-রোদ্দুরে আরাম লাগে না। বাতাসে আর্দ্রতা খুব বেশি থাকায় ভ্যাপসা গরমে কষ্ট পেতে হয়। স্কুল তো অনেক দিনই খুলে গেছে। কয়েকদিন ধরে একনাগাড়ে বৃষ্টি পড়ে রাস্তায় যখন জল জমে থাকে, তখন মনের আনাচে-কানাচে রেনি-ডে'র সম্ভাবনা উঁকি মারতে থাকে। ক্লাস না আরম্ভ হতেই ঢং ঢং করে ছুটির ঘণ্টা বেজে ওঠে। কী মজা, না ? এই সব দিনে কাজের মধ্যে আছে কাগজের নৌকো তৈরি করে জলে ভাসানো আর ঝালমুড়ি ও হজমিওয়ালার কাছ থেকে হজমি, বিলিতি আমড়া কিনে খাওয়া। যেদিকেই তাকানো যায়, ঘন সবুজ। দোপাটির সঙ্গে আছে রজনীগন্ধা, যোজনগন্ধা, জুঁই। কদম আর কামিনী তো বর্ষারই ফুল।

ভাদ্র মাসেও বর্ষার দাপট প্রায় একইরকম চলে। নদীর দু'কূল ছাপিয়ে জল, পুকুর কানায় কানায় উপচে ওঠে। কচুরিপানার বাড়বাড়ন্ত। মাঠঘাট সবুজ-সবুজ। আকাশ-জোড়া মেঘের বদলে তখন দেখা যায় আকাশের খানিকটা নীল, আর অনেকটা অংশ জুড়ে ফুলকপির মতো দেখতে মেঘের স্তূপ। হঠাৎ-হঠাৎ তারা সারা আকাশটা ছেয়ে ফেলে, ঝমঝমিয়ে নামে বৃষ্টি। তারপর আবার খাঁখাঁ রোদ্দুর। মেঘ-ভাঙা সেই রোদ্দুর বড় তীব্র। গরমের দাপট তখনও কমেনি। হাওয়ায় আর্দ্রতা তখনও বড় বেশি। বৃষ্টি না পড়লে তাই ভ্যাপসা গরমে হাঁসফাঁস করতে হয়।

বর্ষাকালে এই ভ্যাপসা গরমের জন্যেই ঘাম হয় বেশি, সেইসঙ্গে ঘামাচিও। ঘামের গ্লানি দূর করতে হলে রোজ ভাল সাবান মেখে স্নান করতে হবে। অচেনা কোম্পানির সাবান মেখে স্নান করা ত্বকের পক্ষে নিরাপদ নয়। নামকরা কোম্পানির ভাল সাবান মেখে স্নান করলে ত্বকের ক্ষতির আশঙ্কা থাকে না এবং শরীরটাও স্নানের পরে ঝরঝরে হয়। ঘামাচির হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে চাই ভাল প্রিকলি হিট ট্যালকম পাউডার। এমন অনেক গায়ে-মাখা সাবানও আছে যা ঘামাচির কষ্ট দূর করে। ভাল সাবান মেখে স্নান করবার পর গায়ে ভাল ট্যালকম পাউডার ছড়িয়ে দিতে পারলে যা আরাম হয় না—শরীর যেন জুড়িয়ে যায়।

এরপরে আছে বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে স্কুলে যাওয়া। এতে সর্দি-কাসির আশঙ্কা বেড়ে যায়। এর থেকে জ্বরজাড়ি হলে তো স্কুল কামাই। সেইজন্যে বর্ষার হাত থেকে বাঁচতে হলে চাই ভাল ছাতা, ভাল রেনকোট। শুধু তো মাথা বাঁচালেই চলবে না, লক্ষ রাখতে হবে বইগুলোও যাতে ভিজে না যায়। সেইজন্যে চাই ওয়াটারপ্রুফ বইয়ের ব্যাগ। পায়ের জুতো ভিজে গিয়ে যাতে ঠাণ্ডা না লাগে, সেইজন্যে পায়ে পরতে হবে গামবুট বা রবারের জুতো।

এইভাবেই গ্রীষ্ম আর বর্ষা বারবার আসবে আর যাবে। আমরা তাদের অবস্থিতি উপভোগ করব আর সেই সঙ্গে যতদূর সাধ্য তাদের দাপট থেকে আত্মরক্ষাও করে চলব।

পাহাড়ে পাহাড়ে আনন্দ আয়োজন—

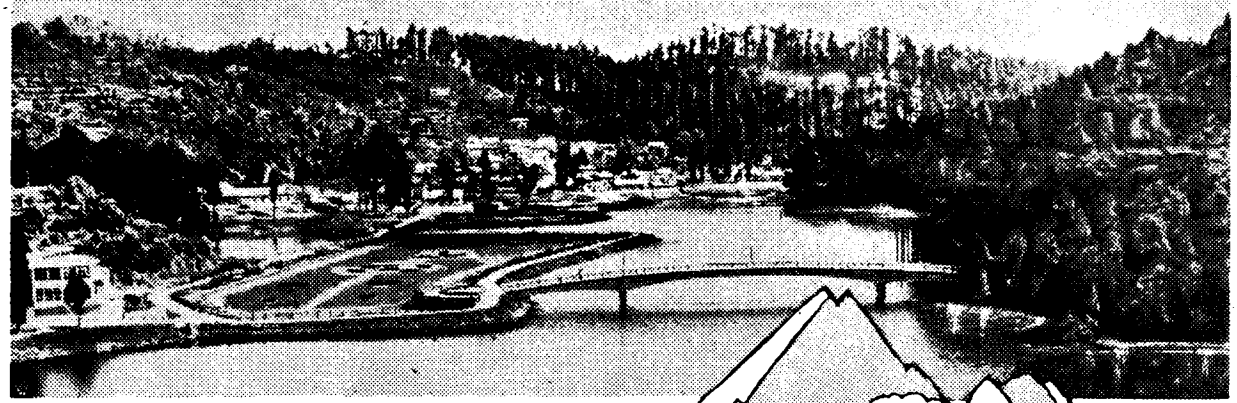

অপরূপ শৈলনগরী দার্জিলিঙ

দার্জিলিঙ মানেই দৃশ্যমালার বৈচিত্র্য আর একরাশ অভিজ্ঞতা। শৈলনন্দিনী দার্জিলিঙ আতিথেয়তায় উষ্ণ, বন্ধুত্বে মধুর। উত্তুঙ্গ হিমালয়ের তুষারমৌলী অপরূপ দৃশ্যমালা—প্রবাদ প্রতিমা কাঞ্চনজঙ্ঘা। ঢেউ খেলানো সবুজ চা-বাগান আর নানান বাহারী ফুল ও তরুলতায় ঘেরা নয়নাভিরাম উপত্যকা। উৎসবে প্রাণচঞ্চল—নাচে-গানে, বাহারী শোভাযাত্রায় উচ্ছল। এছাড়াও আছে রকমারী দোকানপাট, বাজার, মিউজিয়াম আর চিড়িয়াখানা। থাকার জন্য আপনার পছন্দসই একাধিক ট্যুরিস্ট লজ পাবেন।

শান্ত, সুন্দর মিরিক

সবুজ চা-বাগান আর নয়নশোভন কমলালেবুর বাগানের ভেতর দিয়ে দীর্ঘ পথ পেরিয়ে পৌঁছে যাবেন মিরিকের হ্রদে। শান্ত, নির্জন চিরহরিৎ অরণ্যে ঘুরে বেড়ান। হ্রদে নৌকাবিহার করুন। কিংবা ট্যুরিস্ট হোস্টেলের নির্জনতায় বসে উপভোগ করুন প্রকৃতির মধুর দৃশ্য। আরামে-আয়েশে থাকার জন্য ছোট-ছোট কটেজও পাবেন।

আকর্ষণীয় কালিম্পঙ

কালিম্পঙের আবহাওয়া সারা বছরই ঠাণ্ডা এবং রমণীয়। এখান থেকে তিস্তার দৃশ্য দেখুন। হিমালয়ের দুর্লভ কিছু দৃশ্য দেখার জন্য চলুন দুরবীন দারা পয়েন্ট। কিংবা যান স্থানীয় হস্তশিল্পের দোকানগুলিতে অথবা এখানকার জমকালো বাজারে। বাজার বসে সপ্তাহে দুদিন। দোকানপাট রোজই খোলা পাবেন। একাধিক ট্যুরিস্ট লজ পাবেন—রুচি ও সামর্থ্য অনুযায়ী বেছে নিন।

নির্জন কার্শিয়াং

দার্জিলিঙ যাতায়াতের পথে কার্শিয়াং শান্ত, নির্জন, অপরূপ একটি শহর।
স্বীয় সৌন্দর্য্যে কার্শিয়াং চিররমণীয়।
এখানে দেখুন বৌদ্ধ বিহার, ডাউ হিল এবং ঈগলস্ ক্র্যাগ। চমৎকার একটি বার-রেস্টুরেন্ট সমন্বিত এখানকার ট্যুরিস্ট সেন্টারে থাকার ব্যবস্থাও আছে।

সব জায়গাগুলিই দার্জিলিং থেকে খুব কাছে—মিরিক (৪৯ কিমি), কালিম্পঙ (৫১ কিমি) এবং কার্শিয়াং (৩৬ কিমি)।

বিশদ বিবরণ ও বুকিং এর জন্য যোগাযোগ করুন :

ট্যুরিস্ট ব্যুরো এবং রিজার্ভেসন কাউন্টার, ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন

৩/২, বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ (ঈস্ট) কলিকাতা-৭০০ ০০১, ফোন : ২৩-৮২৭১, গ্রাম : TRAVELTIPS. নেহরু রোড, দার্জিলিং ; হিল কার্ট রোড, শিলিগুড়ি
ওয়েস্ট বেঙ্গল ইনফরমেশন বুরো, এ/২ স্টেট এম্পোরিয়া, বাবা খরগ সিং মার্গ, নিউ দিল্লী-১১০ ০০১ ফোন : ৩৪৩৭৭৫,
কবিম ম্যানসন, ৭৮৭, আন্না সালাই, মাদ্রাজ-৬০০ ০০২ ফোন : ৮৫২০৬

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ICA/TB 824 Ri/84

ANANDAMELA 10 JULY, 1985. Regd. No. WB/CC/264. MH-By-SOUTH 683TN/MS(C) 731

জ্যোতির্ময় ত্বক.....এক এমন ত্বক, যার স্বপ্ন আপনি দেখে এসেছেন, চিরটি কাল – আর, আপনার ঐ স্বপ্নকে সফল করবে এই, রেক্সোনা!

রেক্সোনায় আছে চারটি প্রাকৃতিক তেলের মিশ্রণ—কেড, ক্যাসিয়া (দারুচিনি বিশেষ), লবঙ্গ আর টেরিবিন্থ – যা আপনার ত্বকের যত্ন নেয়, স্বাভাবিক উপায়ে।

রেক্সোনা আপনার ত্বক রাখে কোমল ও উজ্জ্বল!

হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন।

LINTAS RX 84 2418 BG